একটি আশঙ্কা : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির তৃণমূলিকরণ — পৃঃ ১৪

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, ৩৭০ ধারা বিলোপ আর রামমন্দির করতেই হবে বিজেপিকে — পৃঃ ২৪

৭১ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ১০ জুন ২০১৯।। ২৬ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

মোদী মন্ত্রিসভা

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী
প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

রাজনাথ সিংহ
প্রতিরক্ষা

অমিত শাহ
স্বরাষ্ট্র

নিতীন গড়করি
সড়ক, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প

সদানন্দ গৌড়া
রাসায়নিক ও সার

নির্মলা সীতারমণ
অর্থ

রামবিলাস পাশোয়ান
খাদ্য ও ক্রেতাসুরক্ষা

নরেন্দ্র সিং তোমর
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ

রবিশঙ্কর প্রসাদ
আইন ও তথ্যপ্রযুক্তি

হরসিমরত কৌর
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

থাওয়র গেহলট
সামাজিক ন্যায়

এস জয়শঙ্কর
পররাষ্ট্র

রমেশ পোখরিয়াল
মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্জুন মুণ্ডা
আদিবাসী কল্যাণ

স্মৃতি ইরানি
নারী ও শিশুকল্যাণ, বস্ত্র

ডা. হর্ষ বর্ধন
স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানপ্রযুক্তি

প্রকাশ জাভড়েকর
তথ্য সম্প্রচার, পরিবেশ

পীযুষ গোয়েল
রেল

ধর্মেন্দ্র প্রধান
পেট্রলিয়াম, ইস্পাত

মুখতার আব্বাস নকভি
সংখ্যালঘু উন্নয়ন

প্রহ্লাদ যোশী
কয়লা ও খনি

মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে
স্কিল ডেভেলপমেন্ট

অরবিন্দ সাওয়ন্ত
ভারী শিল্প

গিরিরাজ সিংহ
প্রাণীসম্পদ, মৎস্য

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
জলসম্পদ

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)

সন্তোষ গঙ্গোয়ার
শ্রম ও কর্মসংস্থান

রাও ইন্দ্রজিত সিংহ
পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা

শ্রীপাদ নায়েক
আয়ুষ ও প্রতিরক্ষা

জিতেন্দ্র সিংহ
পরমাণু ও মহাকাশ

কিরণ রিজিজু
ক্রীড়া

প্রহ্লাদ সিংহ প্যাটেল
সংস্কৃতি ও পর্যটন

আর কে সিংহ
বিদ্যুৎ

হরদীপ সিংহ পুরী
নগরোন্নয়ন ও আবাসন

মনসুখ মান্দভিয়া
জাহাজ, সার

এবারের সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১০ জুন - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

হিন্দু ফোবিয়া উ-কার পালটে হিন্দি ফোবিয়ায় রূপান্তরিত ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : খেপিকে খেপানো আইনত দণ্ডনীয় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

নতুন ভারত গড়তে অর্থনীতিতে প্রয়োজন যুগোপযোগী আরও সংস্কার ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ১১

কাণ্ডারি হুঁশিয়ার ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১১

মোদী ঝড়ে নীড় হারা একঝাঁক ভোটপাখি ▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ১৩

একটি আশঙ্কা : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির তৃণমূলিকরণ ▯ বীথিকা দাস ▯ ১৪

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ও অমর্ত সেনের প্রলাপ ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ১৬

মোদী ম্যাজিকে মিরাকেল ঘটাচ্ছে শেয়ার বাজার ▯ পার্থসারথি গুহ ▯ ১৭

মমতার আচরণে ভারসাম্য হারানোর লক্ষণ স্পষ্ট ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২৩

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, ৩৭০ ধারা আর রামমন্দির করতেই হবে বিজেপিকে ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৪

প্রত্যাশী ভারত : ভরসা মোদীজীর আত্মশক্তি ▯ সুজিত রায় ▯ ২৬

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিষয় এখনই জরুরি ▯ মোহিত রায় ▯ ২৮

মোদীজীর কাছে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান চাই ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩০

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌দর্শন ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ৩১

ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ আদর্শ ভারতীয় মাধ্যম ▯ অমিত ঘোষদস্তিদার ▯ ৩৩

নরেন্দ্র মোদীর এই জয় ভারতের কোটি কোটি মানুষের জয় ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫

পোস্টাল ব্যালটেও নাস্তানাবুদ মমতা ▯ রণিতা সরকার ▯ ৩৭

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা ও কয়েকটি প্রশ্ন ▯ ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী ▯ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ স্মরণে : ৪২▯ খেলা : ৪৩ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯

প্রকাশিত হবে
১৭ জুন
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৭ জুন
২০১৯

বিজেপি কি বেনোজল আটকাতে পারবে?

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভালো ফল করার পর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ধুম পড়ে গেছে। কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম থেকে এসে দলে দলে নেতা-কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু যারা আসছেন তাদের ঠিকমতো পরখ করা হচ্ছে না। সম্প্রতি বিজেপিতে এমন কিছু নেতা যোগ দিয়েছেন যারা দাগি দুষ্কৃতী। বিজেপি কি এই বেনোজল আটকাতে পারবে? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় এই নিয়েই। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুজিত রায় এবং বিমলশঙ্কর নন্দ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রতিশ্রুতি পালন করিতে হইবে

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আরো পাঁচ বৎসরের জন্য এনডিএ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দফার এই জয় এক কথায় প্রথম দফার জয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বলিতে গেলে, ২০১৪ অপেক্ষা ২০১৯-এ মোদী ঝড় আরো বেশি করিয়া দেশব্যাপী অনুভূত হইয়াছে। এই জয়ের সিংহভাগ কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর। বিরোধীদের সম্মিলিত কুৎসা এবং অপপ্রচারের সম্মুখে যেই ভাবে অবিচলিত থাকিয়া তিনি দলকে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবশ্য শিক্ষণীয়। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীকে বাদ দিলে নরেন্দ্র মোদী হইতেছেন সেই দ্বিতীয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি প্রথমবারের অপেক্ষায় অধিক সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আক্ষরিক অর্থেই সমগ্র দেশ এখন মোদীময়। স্বাভাবিকভাবেই দেশের সর্বত্র বিজেপি নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীসকল এখন উল্লাসে মাতিয়াছেন।

কিন্তু এই জয়ে শুধুমাত্র উল্লসিত হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, এই জয় বিজেপির হস্তে আরও বড়ো দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালের প্রথম পাঁচ বৎসরে যে কাজগুলি সম্পূর্ণ করা যায় নাই, সেই কাজগুলিকে এবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা, পাশাপাশি এইবারের নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্ব নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে যে প্রতিশ্রুতি রাখিয়াছেন, তাহা যথাযথ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যদের উদ্দেশে বলিয়াছেন—শুধুমাত্র আনন্দের স্রোতে গা ভাসাইলে চলিবে না। বরং, সবকা সাথ সবকা বিকাশের যে আহ্বান—তাহাকে বাস্তবায়িত করিতে তড়িৎগতিতে কর্মে আত্মনিয়োজিত করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য হইতেই পরিষ্কার—তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতিসমূহ পালনে দায়বদ্ধ। এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি কাজ করিতে চান।

এইবার লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, বর্তমানে মোদী মন্ত্রীসভার দুই নম্বর ব্যক্তিত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নির্দিষ্ট কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আশা করে, সেই প্রতিশ্রুতিগুলিও এখন নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুটি পালন করিবে। নির্বাচনী প্রচারে আসিয়া অমিত শাহ বলিয়াছিলেন, অবৈধ বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের এই রাজ্য হইতে বিতাড়ন করা হইবে। একথা অনস্বীকার্য যে এই অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে এই রাজ্যে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধি পাইতেছে জেহাদি এবং জঙ্গি কার্যকলাপ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থেই মোদী মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইবার এই রাজ্যে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ শুরু করিয়া অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হইবেন—পশ্চিমবঙ্গবাসী ইহাই দেখিতে চাহে। নির্বাচনী প্রচার পর্বেই মোদী-শাহ দেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করিবেন এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলন করিবার লক্ষ্যে অগ্রসর হইবেন। কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্নতাবাদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া দেশের মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করিবার জন্য ৩৭০ ধারা বিলোপ অবশ্য কর্তব্য। দেশবাসী মনে করে এইরকম কাজ বিজেপিই করিতে পারিবে। দেশের মানুষের এই আবেগ এবং ভরসাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই কাজটি বিজেপিকে এইবার করিতেই হইবে। এরই পাশাপাশি বিজেপির সম্মুখে তোষণের রাজনীতির নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করিবার আরও একটি আশু কর্তব্য রহিয়াছে। আরও একটা দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক। তাহা হইল অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ। গত পাঁচ বছর ধরিয়া বিজেপি রামমন্দিরের প্রস্তাব দিয়া আসিলেও মন্দির নির্মাণ হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে শ্রীরামচন্দ্র ভারতবাসী মাত্রেরই আবেগের স্থান। সেই আবেগটিকে বিজেপি মর্যাদা দিবে না—ইহা কখনও কাম্য নহে।

ভরসা একটাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কর্মযোগী। তাঁহার দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে প্রতিশ্রুতিসমূহ তিনি পালন করিবেন—এই প্রত্যাশা মানুষ রাখে।

সুভাষিতম্

সত্যং মাতা পিতা জ্ঞানং ধর্মো ভ্রাতা দয়া স্বসা।

শান্তিঃ পত্নী-ক্ষমা পুত্রঃ ষড়েতে মম বান্ধবাঃ।। (চাণক্য নীতি)

সত্য আমার মাতা, জ্ঞান আমার পিতা। ধর্ম আমার ভাই, দয়া আমার বোন। শান্তি আমার পত্নী, ক্ষমা আমার পুত্র—এই ছ'জনই আমার পরিবারের সদস্য।

হিন্দু ফোবিয়া উ-কার পাল্টে হিন্দি ফোবিয়ায় রূপান্তরিত

বিশ্বামিত্র

ভারতবর্ষে জাতীয় ভাষা বলে কিছু হয় না। জাতীয় ফুল হয়, জাতীয় পশু হয়, এমনকী জাতীয় ক্লাবও হয় কিন্তু জাতীয় ভাষা নৈব নৈব চ। কারণ হলো ভারতবর্ষে 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'। এই বিবিধের মাঝেই ভারত মহান। তবে জাতীয় ভাষা না থাকলেও ভারতে সরকারি ভাষা রয়েছে। সর্বসাকুল্যে এই সরকারি ভাষার সংখ্যা ২২টি। বহুকাল ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ ছিল। এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা ত্যাগ না করতে পারার জন্যই আজও অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে ইংরেজিই প্রথম ভাষা। এর বাইরেও আঞ্চলিক ২১টি ভাষা রয়েছে। উত্তর-পূর্বে নাগাল্যান্ডে তাও, মেঘালয়ে খাসি, মিজোরামে মিজো, সিকিমে নেপালী, অরুণাচল প্রদেশে নিশি, মণিপুরে মণিপুরি, অসমে অসমীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় এবং আন্দামান নিকোবরে বাংলা, দাদরা-নগর হাভেলিতে ভিলি; গুজরাট, দমন-দিউতে গুজরাটি; বিহার, চণ্ডীগড়, ছত্তিশগড়, দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ডে হিন্দি, কর্ণাটকে কন্নড়, জম্মু-কাশ্মীরে কাশ্মীরি, গোয়ায় কোঙ্কনি, কেরলে মালয়ালম, ওড়িশায় ওড়িশি, পঞ্জাবে পঞ্জাবি, তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। অর্থাৎ নিয়মানুসারে সরকারি কাজও এখানে নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় সম্পন্ন হতে পারে যদিও কার্যক্ষেত্রে অনেকসময়ই তা হয় না।

এখানে হিন্দির গুরুত্বটা তবে কোথায়? উপরের তালিকাতেই স্পষ্ট ভারতবর্ষের একটি বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ হিন্দি ভাষাভাষী যা পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা দেশের এক চতুর্থাংশ মানুষ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ লোকই হিন্দিভাষী, এলাকার হিসেবে ধরলে ৪৪ শতাংশ ভারতবাসী হিন্দি সরকারি ভাষা-অঞ্চলে থাকে চলতি কথায় হিন্দি-বলয় বলা যেতে পারে, সেখানে বাস করেন। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য সরকারি ভাষার চেয়ে হিন্দি বেশি বলবান। তাই ইংরেজি ভাষার পরে হিন্দির প্রচলনই সবচেয়ে বেশি, সরকারি ও বেসরকারি কাজে। সংসদের কাজকর্মও তাই হিন্দিতে হয়। ঔপনিবেশিক ভাষাকে সরিয়ে দেশীয় ভাষাকে তার জায়গা দিতে গেলে হিন্দিকে স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য দিতে হবে। সেই কারণেই কেন্দ্র সরকার তার নয়া খসড়া শিক্ষা-নীতিতে হিন্দিকে গুরুত্ব দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দিকে আবশ্যিক করতে চেয়েছিল। আপাতত ঐচ্ছিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এতে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমবে না। কিন্তু ছাত্র- ছাত্রীরা ইংরেজির সঙ্গে হিন্দিতেও পারদর্শী হয়ে উঠলে, তাদের

বিশ্বামিত্র-র কলম

কেরিয়ারেও তারা উপকৃত হবে, এই মাত্র। এই ধরনের কেরিয়ারিস্টিক অ্যাপ্রোচে বাধা দিলে পরিণাম কতটা ভয়াবহ হয়, বাম আমলে প্রাথমিকে ইংরেজি উচ্ছেদেই তার প্রমাণ। ২১টি ভারতীয় ভাষা সরকারি মর্যাদা পেলেও আরও বহু ভারতীয় ভাষা-উপভাষা রয়েছে, এমনকী আন্দামান নিকোবরের মতো জায়গায় যেখানে বাঙ্গালিদের সঙ্গে সমসংখ্যক তামিলভাষীও বাস করেন, সেখানে একটি ভাষাকে বেছে নিয়ে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যেমন বাঙ্গলাকে। এতে তামিলের গুরুত্ব কোনওভাবেই হ্রাস পায়নি আন্দামানে। ফলে বৈশ্বিকীকরণের যুগে ভারতবর্ষে ভারতায়নের সুযোগ ঘটেছে, বাঙ্গলার বাইরে সুদূর তামিলেও যেমন বাঙ্গলাভাষী এলাকা গড়ে উঠতে পারে, দক্ষিণ ভারতীয়রাও বাঙ্গলায় জাঁকিয়ে বসতে পারেন, এই পরম্পরা বহুদিন ধরেই চলেছে।

মুম্বইতে একবার বিহারী খেদাওয়ের ডাক উঠেছিল, 'আমচি মুম্বই'বাসীই তাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে তা প্রতিহত করেন। হিন্দি ভাষায় সর্বমান্যতা নিয়ে স্বাধীনতার পরই দক্ষিণভারতে বিশেষত তামিলনাড়ুতে প্রশ্ন উঠেছিল। আজ সেখানকার বহু মানুষ হিন্দির মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে সংযোগ স্থাপন করেন। এমকে স্ট্যালিনের মতো নেতারা স্কুলে হিন্দি আবশ্যিক করার যে বিরোধিতা করছেন তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এটা সবাই বোঝে। এই স্ট্যালিন নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল।

আসলে গণ্ডগোলটা অন্যত্র, হিন্দির বানানে, ই-কার সরিয়ে উ-কার বসালেই হিন্দু। এতকাল নেহরুবাদী মৌরসীপাট্টায় হিন্দুদের 'সেকুলার' বলা হতো, মোদী-অমিত শাহ এসে সেই মৌরসীপাট্টার ঘুঘুর বাসা ভেঙে দিয়েছেন, এমন কী 'লেফট-লিবারাল' বাংলা (তা সে বাম আমলই হোক, বা তৃণমূল— এদের ছদ্মবেশ বাঙ্গালি চিনে নিয়েছে এতদিনে)-য়ও সেই ঘুঘুরা এতদিনে ফাঁদে পড়েছেন, ফলে নিতান্ত একটি 'কেরিয়ারিস্টিক অ্যাপ্রোচ'-কে কেন্দ্র করে জাতি-দাঙ্গা পরিস্থিতি বাঁধিয়ে গৃহযুদ্ধের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কারণ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মুসলমান তোষণকারী বা যে গোরু দুধ দেয় তার পদাঘাত সহ্য-কারী নেত্রী দেখে নিয়েছেন ৩০ শতাংশের দুধ আর তাঁর ক্ষমতা-কায়েমের পক্ষে উপযোগী নয়, বাকি ৭০ শতাংশের মধ্যে কিছু 'লেফট লিবারাল' বাদ দিলে বাকিদের সমর্থনও পাওয়া দরকার যেটা ২০১৯-তে জোটেইনি, ২০২১-এও আর জুটবে না। তাই তাঁকে দেখতে হচ্ছে 'তাঁরই খেয়ে-পরে' কীভাবে হিন্দুরা আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা আর ভাষাগত সংকীর্ণতা উপেক্ষা করে এককাট্টা হচ্ছে— এই হিন্দু-ফোবিয়া থেকে পালাতে হিন্দি-ফোবিয়ার আশ্রয় না নিয়ে নবান্ন যে অচিরেই তাঁকে আশ্রয় ছাড়া করবে, তার থেকে ভালো আর কেই বা বোঝেন। তাই বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টের দোহাই দিয়ে বাঙ্গলার মানুষকে তিনি বোকা বানাতে চাইছেন। কিন্তু বাঙ্গালি জানে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত আর জাতীয় স্তোত্র দুটিই বাঙ্গালি-রচিত, বাঙ্গলার 'মাতৃ-ভাষা' সংস্কৃত থেকে উৎসারিত। আরবীয় সংস্কৃতির দালালি আসলে এই জাতীয়তাকে আঘাত করার জন্যই, এটা সচেতন বাঙ্গালি বুঝে গিয়েছেন।

খেপিকে খেপানো আইনত দণ্ডনীয়

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

অত্যন্ত রাগ থেকে এই চিঠি। একটা নির্বাচন সবে মিটেছে। সেখানে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ স্লোগান তুলে পাওয়া গেছে বাইশটা। বিধানসভার নিরিখে ফল আরও খারাপ। এখনই ভোট হলে ক্ষমতা থাকবে না। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে প্রিয় রাজীব কুমার যে কোনও দিন জেলে চলে যেতে পারে। তার উপরে কেন্দ্রে যে সরকার টিকবে না বলেছিলেন সেটা শক্তি বাড়িয়ে ক্ষমতায়। মাথা খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ আমি আমার দিদির কথাই বলছি। ঘুমের মধ্যেও যাঁকে জয় শ্রীরাম স্লোগান তাড়া করছে। তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখে জয় শ্রীরাম বলাটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। যাঁরা বলছেন, তাঁরা কিন্তু ঠিক করছেন না।

ছোটোবেলায় আমাদের পাড়ায় এক খেপিকে রাস্তায় দেখলে সবাই ঘুঘনি বুড়ি বলত। কেন বলত জানি না। ঘুঘনি বুড়িও পাল্টা তাড়া করত। আর তাতে ঘুঘনি বুড়ি বলাটা বেড়ে যেত ছেলে ছোকরাদের। ওই খেপিকে খোপানোটা আমি দেখতাম কিন্তু ভালো লাগত না। এখনও লাগছে না।

দিদি তো বলেই দিয়েছেন কেন তাঁর জয় শ্রীরাম নিয়ে আপত্তি। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় স্লোগানকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করছে বিজেপি। তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘জয় সিয়া রাম, জয় রাম জি কী, রাম নাম সত্য হ্যায় ইত্যাদির একটা ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় আছে। আমরা এই অনুভূতিকে সম্মান করি। কিন্তু বিজেপি এই ধর্মীয় স্লোগানগুলির অপপ্রয়োগ করছে। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ব্যবহার করে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশাচ্ছে।’’

প্রথমে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ও পরে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া। ভোটের মধ্যে ও ভোটের পরে দুই জায়গায় বিজেপি সমর্থকদের ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান শুনে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই ক্ষেত্রেই গ্রেপ্তার করা হয় স্লোগান দেওয়ার অপরাধে। আর এর জেরেই চলছে বিতর্ক।

‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান শুনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন রেগে যাচ্ছেন এই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। একই প্রশ্নে সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। ইতিমধ্যেই নানা মিম নিয়ে রসিকতায় মেতেছেন নেটিজেনরা। এবার ‘জয় শ্রীরাম’ নিয়ে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে মমতা লিখেছেন, ‘‘আমার কোনও সমস্যা নেই যদি কোনও রাজনৈতিক দল তাদের সমাবেশে ওই দলের বিশেষ স্লোগান ব্যবহার করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব স্লোগান আছে। আমার পার্টির স্লোগান জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। বামেদের ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অন্যদেরও ভিন্ন ভিন্ন স্লোগান আছে। আমরা একে অপরকে সম্মান করি। জয় সিয়া রাম, জয় রাম জি কী, রাম নাম সত্য হ্যায় ইত্যাদি একটা ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় আছে। আমরা এই অনুভূতিকে সম্মান করি। কিন্তু বিজেপি এই ধর্মীয় স্লোগানগুলির অপপ্রয়োগ করছে। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ব্যবহার করে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশাচ্ছে।’’

মুখ্যমন্ত্রীর এই ফেসবুক পোস্ট নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়া শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই ‘জয় শ্রীরাম’ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি ‘হাস্যকর’ বলে মন্তব্য করেছেন।

এদের সবাইকেই আমার বিনীত জবাব, জয় শ্রীরাম বলা যাবে না। ওটা ভাইরাস। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। একজন মুখ্যমন্ত্রীর যখন পছন্দ নয় তখন বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না তার জবাব দেওয়া যাবে না। দেখুন তৃণমূল কংগ্রেস আসলে ধর্মনিরপেক্ষ দল। দিদিও তাই। কিন্তু তাবলে জয়শ্রীরামকে মেনে নেওয়া যাবে না। ভোট বিপর্যয় নিয়ে প্রথমবার মুখ খুলেই তো দিদি বলেছিলেন, ‘‘টোটালটাই হিন্দু মুসলমান হয়েছে’’। পরে সেই সাংবাদিক বৈঠকেই কলকাতা পুরসভা আয়োজিত ইফতারের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিদি বলেছিলেন, ‘‘আমি যাব। কারণ, আমি তো সংখ্যালঘু তোষণ করি। যে গোরু দুধ দেয় তার লাথিও খাব’’। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ৩১ মে কলকাতা পুরসভার ইফতার আয়োজিত হয়নি। দিদির অন্য কর্মসূচির জন্য তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। সেই ইফতার হয় ও যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসলে শুনুন সেদিন সাংবাদিক বৈঠকে দিদি যা বলেছিলেন তা রাগের কথা। বিজেপি ও গেরুয়া শিবির বারবার সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই রাগেই ও কথা বলেছিলেন দিদি। কিন্তু তৃণমূল আদ্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ দল। এ ব্যাপারে দলের স্লোগানও হলো, ‘ধর্ম যাঁর যাঁর— উৎসব সবার’। বাঙ্গলায় দুর্গাপুজোয় যেমন কার্নিভাল হয়। তার আগে কলকাতায় অন্তত একশটি পুজো প্যান্ডেল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয় সরকার। তেমনই ইদে-ইফতারেও উপস্থিত থাকেন দিদি। ভুলে গেলে চলবে না বড়দিনের রাতে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের প্রার্থনা সভাতেও মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন।

দিদি হচ্ছেন এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক।

— **সুন্দর মৌলিক**

নতুন ভারত গড়তে অর্থনীতিতে প্রয়োজন যুগোপযোগী আরও সংস্কার

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

অর্থনীতিতে বড়োসড়ো পরিবর্তন আনার যে সংস্কারগুলি বাজপেয়ী জমানায় শুরু হয়েছিল তারা ২০০৪ সালে প্রবল সম্ভাবনা ও ফলদায়ী হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়ার সময়ই অপ্রত্যাশিতভাবে বাজপেয়ী সরকার ভোটে হেরে যায়। বিকল্প হিসেবে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসতেই যাবতীয় সংস্কার প্রক্রিয়া থমকে দাঁড়াল। এর পর আবার ইউপিএ-২ সরকার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর অর্থনীতির গঠনমূলক বৃদ্ধির পরিপন্থী এমন কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করল যা ইন্দিরা গান্ধী জমানার কথা মনে পড়ায়।

২০১৪-য় নরেন্দ্র মোদী এনডিএ সরকার গঠনের পর অর্থনীতি আবার সময়োপযোগী সংস্কার অভিমুখী হলো। সরকার তিনটি অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের সাহস দেখাল। কেননা এগুলি অর্থনীতির পুষ্টিকরণে সহায়ক হলেও রাজনীতিগত ভাবে বেশ কঠিন। (১) Insolvency Bankruptcy Code, (২) GST, (৩) Dircet Benefit Transfer (নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাঙ্ক খাতায় তার প্রাপ্য চলে যাওয়া)। একই সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সরকার জোর দেয়। এরই ফলস্বরূপ ইউপিএ-র শেষ দু'বছরে গড়ে ৫.৯ শতাংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারকে পেছনে ফেলে বর্তমান সরকার বিগত পাঁচ বছরে বৃদ্ধির হারকে গড়ে ৭.৫ শতাংশে টেনে নিয়ে গেছে।

ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী আবার ২০১৪-র মতনই বিপুল সমর্থন দিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতায় এনেছে। নিজেদের মনোমত ও আত্মতৃপ্তিদায়ক কিছু হিসেব-নিকেশের ভিত্তিতে মিডিয়ার পণ্ডিতরা অবশ্য সম্ভাব্য ত্রিশঙ্কু সংসদের তত্ত্ব খাড়া করছিলেন। এই হিসেবের মূলে ছিল জাতপাত, ধর্ম ও বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক নানান জটিল ভোটের হিসেব নিকেশ। কিন্তু আপামর সাধারণ ভারতবাসী এই ধরনের কূট-কাচালি বানচাল করে তাদের ভাগ্যের ও দেশের ভবিষ্যত নির্মাণের ভার নরেন্দ্র মোদীর হাতেই নিশ্চিন্তে সঁপে দিয়েছেন।

> আজ অবধি লাগু থাকা প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা আমলাতান্ত্রিক আইন কানুনের সীমানা অতিক্রম করে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের প্রবীণ আধিকারিকদের সততার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করতে হবে। যে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত কাজগুলি দেশহিতে দ্রুত রূপায়নের জন্য হাতে নেওয়া হবে তা সফল করার ক্ষেত্রে আরও যে ধরনের স্বাধীনতার প্রকল্প প্রয়োজন হতে পারে তার নিশ্চয়তা যোগানোর ওপরই প্রকল্পের দ্রুত সাফল্য নির্ভর করবে।

২০২৪ সালে যে এই ধরনের ফলাফল হতে পারে এমন আশা করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই কারণে আগামী পাঁচ বছর সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অন্তবর্তী বছরগুলিতেই দরকার যে কাজ করবে তার ওপর নির্ভর করবে তার ভাগ্য। প্রথমেই জোর দিতে হবে আমলাতান্ত্রিকতার কাদা আর বালির পাহাড়ে আটকে পড়া অর্থনীতির চাকাকে ওঠানোর। দু' অঙ্কের জিএসটি বৃদ্ধি সম্ভব করতে গেলে এটি আবশ্যিক শর্ত।

তা এটা কি করে সম্ভব হবে? মনে রাখতে হবে একটি প্রধান আপ্তবাক্য যে বেসরকারি পুঁজিপতিরাই অর্থনীতির যথার্থ চালিকাশক্তি। সরকার কখনই নয়। আমাদের দেশে সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর একটা বদ্ধমূল ধারনা আছে যে যা কিছু জনগণের সরকার তার সবকিছুই সরকার করে দেবে। আর ভাগ্যের পরিহাসে আমাদের সরকারি আমলারাও এমনটা ভাবতে ভালোবাসেন যে কেবল তাঁরাই পারেন দেশের যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে।

এই ধারনা ও ব্যবস্থায় পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা জরুরি। সরকার দেশে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সহায়ক একটি পরিমণ্ডল তৈরি করে দেবে। এই কাজটা

করতে দেশের আইন, কানুন, পরিচালন পদ্ধতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সময়োপযোগী পরিবর্তন আনা সরকারের কর্তব্য। এমন পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার পর উদ্যোগপতিদের কাজই হবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গতি আনা। নতুন উদ্যোগ তৈরি করা, যাতে দ্রুত চাকরি তৈরি হয়। বলা দরকার যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদন প্রক্রিয়া দেশের মানুষের সরাসরি কোনো কাজে লাগে না তা থেকে সরকারকে বেরিয়ে আসতে হবে।

অবশ্যই, ব্যবসায়িক উদ্যোগের কোনটা প্রত্যক্ষ সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকবে কোনটা বেসরকারী মালিকানার অধীনে যাবে তা নির্ধারণ করতে ব্যাপক ও কঠিন সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা জরুরি এত বড়ো ধরণের সংস্কার কি পাঁচ বছরের সময়সীমায় করা যাবে?

মোদী সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের নির্দেশ ও নজরদারির মাধ্যমে আমলাদের ওপর প্রয়োজন মাফিক সীমিত নির্ভরতার মাধ্যমে একটি সফল মডেল তৈরি করতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বিভিন্ন দপ্তরে কয়েকজন সচিবকে নিয়ে এক একটি গ্রুপ তৈরি করা। তাদের ওপর প্রজেক্ট তৈরি করার, তার সফল রূপায়ণের পথনির্দেশ করার ভার দিয়ে অর্থনীতির নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সেগুলিকে প্রত্যক্ষ সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করানোর। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে আমলারা প্রজেক্টগুলির প্রেজেন্টেশন তৈরি করার পর প্রধানমন্ত্রী নিজে তাঁর সমগ্র মন্ত্রীসভা সমেত এই ধরনের প্রকল্পগুলির ফলিত সাফল্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। এই দীর্ঘ চর্চার পর বিষয়গুলি চূড়ান্ত হয়ে গেলে পরের বছর যে যে ক্ষেত্রগুলির জন্য প্রকল্প চিহ্নিত হয়েছে সেখানেই এগুলির বাস্তব রূপায়ণ হতো।

এই ধরনের কাজের ধারার বড়ো সুবিধে হচ্ছে যে আমলারা উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা মন্ত্রীদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্পগুলির দায়িত্বভার বহন করছেন। এগুলির সফল রূপায়নের ক্ষেত্রেও তারা তাই নিষ্ঠাভরে এগুলির সাফল্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করত। কিন্তু রেডিকাল রিফর্মস্ বা খোল-নলচে পাল্টানো চরিত্রের সংস্কার কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধেও আছে। আমলারা চরিত্রগতভাবে সাবধানি তারা নানাবিধ প্রকল্প ও সাধারণ উদ্যোগ ইত্যাদির মধ্যেই কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু তারা যখন কোনো নীতিগত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয় তা সাধারণত হয় আংশিক বা পুরনোটির ওপর কিছুটা ঘষামাজা মাত্র।

বড়ো ধরনের সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা একটু অন্যরকমের প্রকরণের রাস্তা বলছি। প্রাথমিকভাবে সরকার অন্তত আধ ডজন বিশেষ ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করুক যেখানে মৌলিক সংস্কার করা হবে। এগুলি হওয়া উচিত শ্রম আইন, জমি আইন, উচ্চশিক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিলগ্নীকরণ, ব্যাঙ্কিং সংস্কার ও কেন্দ্র পরিচালিত সর্বভারতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে। এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এই সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে এমন একজন আমলাকে মাথায় বসিয়ে একটি সময় বেঁধে দিতে হবে। দু' মাসের সময়সীমার মধ্যেই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের প্রধানরা নিজের নিজের ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট রোড ম্যাপ তৈরি করে যাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের মৌলিক সংস্কার নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকরী করা যায় তার দিশা দেখাবেন।

প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই এই প্রকল্পগুলি যাতে গতি পায় তার জন্য নিয়ম করে তদারকি করবেন। মাঝে মাঝেই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট নেবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রকল্পের প্রধানদের যেন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে বা চটজলদি পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়লে তা দ্রুত 'একের সঙ্গে এক' হিসেবে বিনিময় করার সুযোগ থাকে। আমাদের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় কোনো দপ্তর, অধিকর্তা বা বিভিন্ন মন্ত্রকের কাছ থেকে বহু সময়ই 'রোড বক্ক' খাড়া হয়ে যায়।

প্রত্যেক প্রকল্প প্রধানের উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন যে বিষয়ে কাজের পরিকল্পনা করা হচ্ছে সেই সংক্রান্ত নিবিড় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী একজন বিশেষজ্ঞ। এক্ষেত্রে তরুণ ও প্রতিভাবান একদল পেশাদারকে বিভিন্ন প্রকল্প প্রধান ও তাঁর উপদেষ্টাকে সাহায্যের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে। নীতি আয়োগ ও রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের ক্ষেত্রে সম্প্রতি আমলাতন্ত্রের বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন তরুণ পেশাদারদের একটি দল চমৎকার কাজ করেছে। এরা বিভিন্ন মন্ত্রক ও প্রকল্প প্রধানদের মধ্যে সেতুর কাজ করে দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্পের রূপরেখা চূড়ান্ত করেছিল।

প্রত্যেক প্রকল্প প্রধানের অধীনে এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বাজেটের টাকার পূর্ব অনুমোদন থাকা উচিত। সেই টাকা তিনি যেন স্বাধীনভাবে প্রয়োজনানুযায়ী খরচ করতে পারেন। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খরচের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বারবার অধিকর্তার কাছ থেকে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়ার বদলে এই কাজ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক আগাম তিন মাসের সম্ভাব্য খরচের অনুমোদন আগেই করিয়ে রাখতে হবে। যাতে অযথা সময় না নষ্ট হয়।

আজ অবধি লাগু থাকা প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা আমলাতান্ত্রিক আইন কানুনের সীমানা অতিক্রম করে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের প্রবীণ আধিকারিকদের সততার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করতে হবে। যে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত কাজগুলি দেশহিতে দ্রুত রূপায়নের জন্য হাতে নেওয়া হবে তা সফল করার ক্ষেত্রে আরও যে ধরনের স্বাধীনতার প্রকল্প প্রয়োজন হতে পারে তার নিশ্চয়তা যোগানোর ওপরই প্রকল্পের দ্রুত সাফল্য নির্ভর করবে।

(লেখক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ)

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৫০০ টাকা

রম্যরচনা

দিদি চলল রাঁচি

হেড অফিসের বড়দিমণি এমনিতে সে শান্ত
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জানত?
দিব্যি ছিল খোশমেজাজে স্করপিওতে চেপে
পথের ধারে 'শ্রী-রাম' শুনে হঠাৎ গেল ক্ষেপে।
'পালাস কেন, আয় এদিকে এত্ত বুকের পাটা'।
এই না বলে ভিড়ের দিকে হঠাৎ দিল হাঁটা।
'সাহস কত, অসভ্য সব আমাকে দেয় গালি,
আমার খেয়ে আমার পরে আমাকেই হাততালি!
সব কটাকে তোল গাড়িতে দেব কঠিন সাজা
হাত-পা বেঁধে ধোলাই দিলে, বুঝবে কেমন মজা।'
এই না বলে রাগের চোটে দিল একটা হাঁচি
দিল্লি যাওয়ার নাম করে সে
চলল সোজা রাঁচি।

উবাচ

"হিন্দু বাঙ্গালিরা যে দুর্গাপুজো করে তার অন্য নাম অকালবোধন। যার সূচনা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সেই শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনির যারা নিন্দে করেন তারা বাঙ্গালি হিন্দুর শত্রু।"

তথাগত রায়
মেঘালয়ের রাজ্যপাল

পশ্চিমবঙ্গে জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে

"সরকার শীঘ্রই তিন তালাক বিরোধী বিল আনবে।"

মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী

"সুষমা স্বরাজজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পেরে গর্ব অনুভব করছি।"

বিদেশে বিপদে পড়া একটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পর

এস. জয়শঙ্কর
কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

"বাঙ্গলায় বিজেপির স্লোগান হবে জয় শ্রীরাম আর জয় মহাকালী। বাঙ্গলার সর্বত্র মহাকালী বিরাজ করেন। আমরা তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"

মমতার শ্রীরাম বিরোধী মন্তব্য প্রসঙ্গে

কৈলাস বিজয়বর্গীয়
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পর্যবেক্ষক

"মুখ্যমন্ত্রী পাড়ার খেন্তিবুড়ির মতো আচরণ করছেন। অনেক পাড়ায় এরকম খেন্তি বুড়ি থাকে। তাদের খেপালে অশ্রাব্য গালাগাল দেয়। একজন মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আচরণ শোভা পায় না।"

জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে মমতা ব্যানার্জির উষ্মা প্রসঙ্গে

মুকুল রায়
বিজেপি নেতা

কাণ্ডারি হুঁশিয়ার

ড. জিষ্ণু বসু

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে জিতিয়েছেন। এ রাজ্যে বহুদিন থেকেই রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক উন্নয়ন, সৎ যোগ্য নেতৃত্বের জায়গা দখল করে নিয়েছিল পেশিশক্তির আস্ফালন, সিন্ডিকেটের অর্থ আর পাইয়ে দেওয়ার নোংরা খেলা। এইসব যুদ্ধাস্ত্রে অনেক বুথ পাওয়া যাবে যেখানে বিজেপি একজন এজেন্টও বসাতে পারেননি, প্রচুর বুথ এমন আছে যেখানে বিজেপি এজেন্টকে আধঘণ্টার মধ্যে মেরে ধরে, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সব বুথেও বিজেপি জিতেছে। মানুষ জিতিয়েছে। শাসকদলের গুন্ডাবাহিনীর কাছে বিজেপি অনেক জায়গাতেই দুর্বল ছিল। এই অসম পেশিশক্তির লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। মা-বোনেরা লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে রণংদেহি মূর্তিতে রুখে দাঁড়িয়েছেন, কেন্দ্রীয়বাহিনীর দাবিতে ভোট হতে দেননি সাধারণ ঘরের মেয়েরা। বুকের পাঁজর যেমন ছোট্ট হৃদপিণ্ডকে রক্ষা করে, আপাত নিরীহ ব্রজবাসী যেমন শিশু কৃষ্ণকে রক্ষা করেছিল, তেমনি করেই এবার বিজেপিকে জিতিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। এই আশায় যে, ভারতীয় জনতা পার্টি হৃদ্‌পিণ্ডের মতো পশ্চিমবঙ্গের সারা শরীর থেকে দুষিত রক্ত বের করে শুদ্ধ রক্তের সঞ্চার করবে। বিজেপি শ্রীকৃষ্ণের মতো কংসের ধ্বংস করবে আর সুশাসন ফিরিয়ে আনবে। এ রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করেছে, এরাই পারবে। কারণ এদের সাধনা আছে। ধুপকাঠি যেমন একটু একটু করে জ্বলে নিজে শেষ হয়ে যায়, আর ঘরটা সুগন্ধে ভরে যায়, তেমন এদের সঙ্গে কিছু মানুষ আছেন যারা দেশের জন্য, মানুষের জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে নীরবে চলে যায়।

সাবেক পশ্চিম দিনাজপুরের হিলি থানা। গ্রামের নাম মুরারীপুর। কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র প্রশান্ত মণ্ডল। 'পরম বৈভবশালী' দেশ গড়ার স্বপ্ন প্রশান্তর চোখে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার মাঠে প্রতিদিন ব্যায়াম, ছেলেদের জোগাড় করে শারীরিক কসরত, তারপর প্রার্থনা। এই অপরাধে ১৯৮৪ সালের ১৫ মার্চ শাখার মাঠে আক্রমণ করল বামপন্থী হার্মাদরা। প্রশান্তকে সেখানেই খুন করল হার্মাদরা। কিন্তু তাতে দমানো যায়নি মণ্ডল পরিবারকে। প্রশান্তের দাদা সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে গেলেন। একভাই দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ দিলেন, আর অন্য ভাই সারাজীবন একটু একটু করে ভক্তি দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করলেন। উত্তরবঙ্গে মানুষ তো এদেরকে দেখেছেন।

সুন্দরবনের সোনাখালির অজগ্রাম উত্তর মোকামবেড়িয়া। গরিব ঘরের ছেলে ছিল অভিজিৎ সরদার। অনেক কষ্টে বিএসসি পাশ করেছিল দারুণ ভালো নম্বর নিয়ে। গ্রামে মৌলবাদীদের অত্যাচার বন্ধ করবে, গ্রামকে স্বাবলম্বী করবে, গ্রাম থেকে মেয়ে অপহরণ বন্ধ করবে এমন অনেক স্বপ্ন নিয়ে আর এস এস সংগঠনে যোগ দিয়েছিল লালু ওরফে অভিজিৎ সরদার। তার যোগ্য নেতৃত্বে জড়ো হয়েছিল অনাদি নস্কর, পতিতপাবন সরদার আর সুজিত সরদারের মতো তরতাজা যুবক। ২০০১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি একদিনে ভারতমায়ের সেবায় বলিদান হলো চার চারটে প্রাণ। জেহাদিরা ঠাণ্ডা মাথায় আনার হোসেনের বাড়িতে খুন করল চারজন প্রতিবাদী, নিঃস্বার্থ, সমাজসেবী ছেলেকে। দক্ষিণবঙ্গের মানুষ দেখেছেন এই মতে যারা বিশ্বাস করেন, এই আদর্শ মাথায় নিয়ে যারা চলছেন তারা প্রয়োজনে নিজের প্রাণটাও দিতে পারেন। রাজ্যের মানুষ দিনের পর দিন এদের দেখছেন, এই আদর্শের প্রতি ভরসা করেছেন।

> **আজকের লড়াই জেতার জন্যও শত শত প্রশান্ত মণ্ডল, অভিজিৎ সরদার, অনাদি, পতিতপাবন, সুজিতরা টকটকে লাল রক্ত দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। একবার ডাক দিয়ে দেখুন না! তা না করে যদি ভাড়াটে গুন্ডা, জেহাদি নরপিশাচ, দাগি আসামিদের দলে নেন, তবে এতকালের এত তপস্যা বৃথা হয়ে যাবে।**

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ রাজ্যে গণতন্ত্রকে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি এই নারকীয় পরিস্থিতিতেও কাজ করেছে। ব্লকে ব্লকে কাজ করেছে, গ্রামে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে মানুষের সংগঠন তৈরি করেছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে যুবকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিস্তারক হিসাবে কাজ করেছে। কত ছেলেকে মেরে মাথা ফাটিয়ে, হাত-পা ভেঙে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তবু সেইসব ডাকাবুকো ছেলেরা মাটি কামড়ে থেকে কাজ করেছে। তৈরি করেছে শক্তিকেন্দ্র। এক একটি মণ্ডলে একত্রিত করেছে শত শত কোটিবদ্ধ দেশভক্ত সাহসী নারীপুরুষ। বিজেপির জয়ের পরতে পরতে লেগে আছে এদের ঘাম আর রক্তের দাগ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের তিনটি স্তরই বিরোধী শূন্য হবে এমনই দাবি ছিল শাসকদলের। এমন বিকৃত রুচির দাবি কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও দল করতে পারে? কিন্তু এই ভয়ানক কংসের মতো আসুরিক প্রতিপক্ষের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিজেপি কর্মীরা।

বাঁকুড়ার রানিবাঁধের সাঁওতাল পরিবারের ছেলে অজিত মুর্মু। দারুণ সাহসী ছেলে। স্ত্রী ঊর্মিলাকে বলে গিয়েছিল ভাত রান্না করে রাখতে পঞ্চায়েতের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে এসেই খেতে বসবে। অজিত মুর্মু আর তার জনা কুড়ি সহযোগীর উপর বোমা, পিস্তল, ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। রানিবাঁধে গত বছর ৫ এপ্রিল প্রাণ দিলেন অজিত মুর্মু। সেই শুরু, তারপর সারা রাজ্যে ৫৪ বিজেপি আর এস এস কর্মী গত এক বছরে প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের বলিদানের বেদীমূলেই আজ বিজেপির জয়ের ভিত্তি তৈরি করেছে। এই দেওয়াল লেখা যদি আজকের বিজেপি নেতৃত্ব পড়তে না পারে তাহলে কপালে দুঃখ আছে!

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহুদিন সুশাসন দেখেনি। নিষ্ঠুর রাজনৈতিক ধান্দাবাজি, দলদাস পুলিশ-প্রশাসন আর সিন্ডিকেট সর্বস্ব নেতা- নেত্রীর অত্যাচার থেকে মুক্তি চায় পশ্চিমবঙ্গ। মানুষ মন থেকে চায় সারদাকাণ্ডে যারা অপরাধী তারা জেলের ভেতর থাকুক। যে গরিব মানুষগুলো সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যারা সব হারিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, যে এজেন্টরা ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন, গণপ্রহারে মারা গেছেন—এত মানুষের কান্না, এত পাপের বিচার হবে না? শিক্ষকদের এ রাজ্যে চরম অপমানজনক অবস্থা। শিক্ষা এখানে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আর উচ্চশিক্ষার মান একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। এ রাজ্যে শিল্পস্থাপন বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের হাতে কাজ নেই। ক্ষেতে ফসলের দাম নেই, গ্রাম থেকে শহরে কোথাও মহিলারা সুরক্ষিত নয়। মানুষ এই নরকের থেকে মুক্তি পেতে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচন দুটো আদর্শের লড়াই ছিল। শক্তিশালী নেতৃত্ব, দেশপ্রেম, দুর্নীতির সঙ্গে আপোশহীন লড়াই করেছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কৃতিত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করেছেন 'সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের' মাধ্যমে। বিগত এনডিএ সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য যত বড়ো উপকার করেছে, তা স্বাধীন ভারতবর্ষে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। তাই পশ্চিমবঙ্গে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে সব জায়গার সাধারণ মানুষ তা অনুভব করেছেন। যেখানে তারা ভোট দিতে পেরেছেন সেখানেই বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। ডায়মন্ডহারবারের মতো কিছু লোকসভায় সেই ভয়ে গ্রামকে গ্রাম হিন্দু ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়েছে শাসক দল।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা একযোগে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু সেটা মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়। ভোট দিয়েছেন জেহাদি সন্ত্রাসের বিপক্ষে। ১০ হাজারের বেশি খারিজি মাদ্রাসাকে অনুমোদন দিয়েছিল বর্তমান রাজ্য সরকার। সেখানেই তৈরি হয়েছে সিমুলিয়ার মতো সন্ত্রাসের আতুড়ঘর। সেখান থেকেই খাগড়াগড়ের মতো বিস্ফোরক তৈরি কারখানার পরিকল্পনা হয়েছিল।

২০১৪ সালের এই ইম্প্রোভাইস এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস তৈরির কারখানা যখন সামনে এল তখন থেকেই রাজ্যের মানুষ মন ঠিক করা শুরু করেছে। ২০১৬ সালের কালিয়াচকের আক্রমণে লুঠ হয়ে গিয়েছিল একটা আস্ত পুলিশ থানা। ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে এত সাংঘাতিক জেহাদি ঘটনায় রাজ্যবাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ রাজ্যের শিক্ষিত, মুক্তমনা, দেশপ্রেমিক মুসলমান সমাজ গত ৫ বছরে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিন তালাকের মতো অমানবিক মধ্যযুগীয় প্রথাকে তুলে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার। সেই আন্দোলনের সূচনা এ রাজ্য থেকেই হয়েছিল। এ রাজ্যের দেড় শোর বেশি সহৃদয় মুসলমান নারী-পুরুষ নিজেদের খরচে দিল্লিতে গিয়ে 'তিন তালাক' অবলুপ্তির দাবিতে ধরনা দিয়েছেন। তাদের কেউ অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কেউ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, কেউ উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক। কাজী নজরুল ইসলামের বাঙ্গলায় সৈয়দ মুজতবা আলির বাঙ্গলায় এই মুখগুলোই দেখতে চায় এ রাজ্যের মানুষ। তা না করে অন্য ভোট ব্যবসায়ী দলগুলির মতো বিজেপিও যদি মৌলবাদী মুসলমান, দাগি আসামিদের দলে এনে ভোট আশা করে তবে, ওই মৌলবাদীদের সঙ্গে একই আস্তাকুঁড়ে স্থান হবে বাঙ্গলা বিজেপির।

আজ এই বিজেপির বিজয়রথ যাত্রার দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতার লাইনগুলো বারবার মনে পড়ছে। যেখানে সবার নাচন কোঁদন দেখে অন্তর্যামী হাসছিলেন। এই রথযাত্রার অন্তর্যামী তো জনতা জনার্দন। তিনি হাসছেন না তো?

অপরাধীদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য অপরাধীদেরই প্রয়োজন, এটি অর্থহীন সর্বনাশা যুক্তি। এতকাল সঙ্ঘের লড়াই, শ্যামাপ্রসাদের লড়াই, জনসঙ্ঘের লড়াই, ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াই নিঃস্বার্থ কার্যকর্তারা লড়াই করেছেন। আজও জিততে হলে সেই লড়াই করে আত্মবলেই জিততে হবে। হিলির প্রশান্ত মণ্ডল কিংবা সোনাখালির অভিজিৎ সরদার সমাজবিরোধী গুন্ডা ছিলেন নাকি? প্রশান্তর সহজ সরল জীবনের জন্য গ্রামের সবাই ঠাকুরদা বলে সম্বোধন করত। গ্রামের বাচ্চারা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে অভিজিতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে স্কুলে যেত। যেন অভিজিতের মতো ভালো ছেলে হতে পারে মোকামবেড়িয়ার অন্য বাচ্চারা।

আজকের লড়াই জেতার জন্যও শত শত প্রশান্ত মণ্ডল, অভিজিৎ সরদার, অনাদি, পতিতপাবন, সুজিতরা টকটকে লাল রক্ত দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। একবার ডাক দিয়ে দেখুন না! তা না করে যদি ভাড়াটে গুন্ডা, জেহাদি নরপিশাচ, দাগি আসামিদের দলে নেন, তবে এতকালের এত তপস্যা বৃথা হয়ে যাবে। এ রাজ্যের মানুষ আপনাদের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। একবার ভারতমাতার সামনে দাঁড়িয়ে বলুন না—

'জয় লোভে, যশ লোভে, রাজ্য লোভে অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।'

সারা বঙ্গভূমি বরমাল্য নিয়ে আপনাদের জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা আত্মবলোকন করুন।

মোদী ঝড়ে নীড় হারা একঝাঁক ভোটপাখি

সোমনাথ গোস্বামী

সপ্তদশ লোকসভা শেষে ভারতের আকাশ আবারও গেরুয়া। আগের থেকে আরও গাঢ়। আরও বিস্তৃত, আরও ঘন। ইন্দিরা গান্ধীর পর নরেন্দ্র মোদী প্রায় ৪৮ বছরের ব্যবধান। পর পর দুটো লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের বিরল কৃতিত্ব। অন্যদিকে পরপর দুবার বিরোধী দলের স্বীকৃতি অর্জন করতে ব্যর্থ দেশের সব থেকে পুরানো রাজনৈতিক দল। এই লোকসভা ভোট পরিবর্তিত ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের নানা প্রান্তে ভোট পাখিরা নানা কলরবে মত্ত ছিল। কেউ রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বিরোধী ঐক্যের সলতে পাকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, কেউ আবার সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি নিয়ে জোর দরবার করছিল। এমনকী ২২টা রাজনৈতিক দলের সরকার গঠনের দাবিপত্রের খসড়া সংবাদমাধ্যমে ঘুরছিল। দিনের শেষে দেখা গেল সলতে পাকানোই সার, প্রদীপটাই ফুটো হয়ে গিয়েছে। দুই রাজ্যের দুই যাদব প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে পড়ল। বিজেপির হাত ছেড়ে বিরোধী জোটের মুখ হয়ে ওঠার চেষ্টায় রত চন্দ্রবাবু ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। আর বাঙ্গলাকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি ভেবে বসা দিদির সাধের ঘাসফুল বাগান আজ উজাড় হবার অপেক্ষায়। তোষণ আর পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করে দশকের পর দশক ধরে নিজেদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান চালানো তথাকথিত আঞ্চলিক দলগুলি আজ অস্তিত্ব সংকটের মুখে। পরিবর্তিত ভারতবর্ষের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদী শুধু এই মুহূর্তে বিশ্বের সব থেকে জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের জনমানসের রাষ্ট্রচেতনার নব দিগন্তের পথিকৃৎ। সপ্তদশ লোকসভা পরবর্তী ভারতবর্ষের পরিবর্তিত বৃহৎ প্রেক্ষাপটগুলি হলো—

১। এই ভারত নব যৌবনের ভারত, যাদের রাজনৈতিক চেতনা জাতিবাদ কিংবা আঞ্চলিকতাবাদের সংকীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে রেখে জাতীয়তাবোধকে আপন করে নিয়েছে। তাই পারিবারিক প্রতিষ্ঠান চালানো আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ এই যুবকদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক, হাস্যস্পদ। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে রাজনৈতিক কৌতুকের একটা বড়ো অংশ আবর্তিত হয় এঁদেরকে ঘিরেই আর দেশের সব থেকে প্রাচীন রাজনৈতিক দলের কাণ্ডারি তো দেশের যুবা প্রজন্মের সব থেকে বড়ো কৌতুকের খোরাক।

২। বিগত পাঁচ বছরে হিন্দুত্বের যে নবজাগরণ হয়েছে, বিরোধী দলগুলো তাকে নস্যাৎ করে তাদের পুরনো ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতিতে মশগুল থেকেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যে সংখ্যগুরু সমাজের প্রতি উদাসীন থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছের লোক হয়ে ওঠা নয়, এই বাস্তব চেতনাটি আমাদের প্রায় সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষ করে এই রাজ্যের শাসক দলের কাছে অপ্রিয় ছিল। আজ জয় শ্রীরাম বললে এই রাজ্যে তিরস্কৃত হতে হয়, কিন্তু আসাউদ্দিন ওয়াইসি কিংবা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো লোক মুখ্যধারা রাজনীতিতে থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে পুরোদস্তুর ধর্মীয় মৌলবাদের প্রচার করলেও কেউ টুঁ শব্দ করে না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উদারতার সুযোগে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো ঘৃণিত কাজকে এই রাজ্যে তথা সমগ্র দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আগামী পাঁচ বছর নিজের ব্যক্তিস্বার্থের কথা না ভেবে একটু দেশের কথা ভাবতে হবে, অন্তত দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে নিজেদের উপস্থিতিটুকু জানান দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে, নচেৎ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

৩। দেশের ভোটররা আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন, তারা ক্ষণস্থায়ী পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বোঝেন এবং তার কুপ্রভাব সম্পর্কে অবহিত। তাই ন্যায়-এর থেকে জিএসটি যে দেশের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনেক বেশি লাভজনক তা তাঁরা বোঝেন। এখনকার যুবক-যুবতীরা সরকারি চাকরির লোভে দাদা-দিদিদের দলদাস হয়ে নিজেদের যৌবন বিসর্জন দেওয়ার থেকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। এই যুবসমাজ নিজেদের এই দেশের একজন স্বতন্ত্র নাগরিক হিসেবে ভাবতেই বেশি ভালোবাসে, কোনো জাতের বা কোনও আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে নয়। তাই তাদের মসিহা সেজে সরকারি চাকরির টোপ দিয়ে তাদেরকে নিজেদের ভোটেব্যাঙ্কে পরিণত করার দিন শেষ।

৪। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের মহিলারা বিগত পাঁচ বছরে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে যেভাবে নিজেদেরকে গুরুত্ব পেতে দেখেছেন তা অভূতপূর্ব। নারী সশক্তিকরণ মানে যে শুধু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নয়, একেবারে গোড়া থেকে পরিবারের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত করে তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ দেশের কোটি কোটি মহিলার দ্বারা স্বীকৃতি।

৫। শক্তিশালী দেশের বুনিয়াদ হলো আপোশহীন জাতীয়তাবোধ জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করা। ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে যে একমাত্র নরেন্দ্র মোদীই পারেন তা এ দেশের মানুষ জানে। বিগত পাঁচ বছরে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ভারত-সিংহের গর্জন শোনা গিয়েছে, যা আগামীদিনে আরো বেশি করে অনুভূত হবে।

তাই আগামী পাঁচ বছর নিজের ব্যক্তিস্বার্থের কথা না ভেবে একটু দেশের কথা ভাবতে হবে, অন্তত দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে নিজেদের উপস্থিতিটুকু জানান দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে, নচেৎ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। ■

একটি আশঙ্কা : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির তৃণমূলিকরণ

রাজ্য রাজনীতি

বীথিকা দাস

আমরা বামফ্রন্টের শাসনকাল দেখেছি। তাদের ক্যাডার তৈরি হতো অত্যন্ত অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে। তারা নির্বাচনে দাঁড় করাতো এমন ব্যক্তিদের যাদের দলের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। আমার মনে হয় ৩৪ বছর একটানা শাসন ক্ষমতায় থাকার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যদিও শেষের পাঁচ বছর তারা ক্ষমতার দম্ভে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে এবং তার ফলও হাতে হাতে পেয়ে গেছে।

এরপরই ক্ষমতায় এল তৃণমূল। তৃণমূল ক্ষমতার স্বাদ পেতে শুরু করে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরেই। সেই নির্বাচনে তৃণমূল একটি আসন থেকে ২২টি আসন পেয়ে যায়। আজকের বিজেপির সঙ্গে বিষয়টি মিলে যাচ্ছে। শুরু হয় বেনো জলের প্রবেশ। মনে রাখতে হবে, বন্যার জল কখনোই পানের উপযোগী হয় না। সেটাকে পানের উপযোগী করে তুলতে হলে যে পরিমাণ পরিশোধন করতে হয় তা খাজনার চেয়ে বেশি বাজনার শামিল। ফলত যা হবার তাই হয়েছে। কিছু সুযোগসন্ধানী কংগ্রেসি, কিছু কমিউনিস্ট এবং কিছু বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগদান করে। আবার কিছু নেতাকে ভয় ও লোভ দেখিয়ে তৃণমূলে শামিল করা হয়। এতে সাময়িক লাভ হয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু বিষয়টিকে সাধারণ মানুষ মোটেও ভালো ভাবে নেয়নি।

যিনি ছিলেন সততার প্রতীক, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন তোলাবাজ ও সিন্ডিকেটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিষয়গুলি বুঝতে পারেননি এমনটা আমার মনে হয় না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু একইসঙ্গে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছিলেন। চারিদিকে স্তাবক পরিবৃত হয়ে পড়েছিলেন এবং দলে একটাই পোস্ট এবং বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট করে রেখেছিলেন। সাধারণ সমর্থকরা তাকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাদের তিনি বিরোধী ভেবেছিলেন। ফল তিনি হাতেগরম পেয়েছেন। তার সম্পর্কে দুটি উক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অরুণাভ ঘোষ বলেছেন, ''তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন এবং লিফটে করে নামছেন।'' ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেছেন, ''তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) হলেন সিপিআইএম-এর সুযোগ্য ছাত্রী।'' সিপিআইএম যেখানে শেষ করেছিলেন তৃণমূল সেখান থেকেই শুরু করেছে। (তৃণমূলিদের নিয়ে বিজেপি ভর্তি করলে আবার এখান থেকেই বিজেপি রাজ শুরু হবে)। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার বছর খানেকের মধ্যেই শুরু হলো তোলাবাজি। বিধবা ভাতা থেকে একশো দিনের কাজ, রাস্তা সারাই থেকে ব্রিজ নির্মাণ কিছুই বাদ যায়নি। সর্বত্র তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটরাজ। কারণ যারা এই দলে এসেছিলেন তারা প্রায় সকলেই করেকম্মে খাবার জন্যেই এসেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৃণমূলে এসেছে এমন লোক খুব বেশি নেই। যার ফলে সিপিআইএম যেমন চুষে খেয়েছিল এরা সেখানে কামড়ে ও গিলে খাওয়া শুরু করলো। সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। অথচ মানুষ তৃণমূলকে দু'হাত উজাড় করে দিয়েছিলেন। ২০০৯, ২০১১, ২০১৪ ও ২০১৬ সালের লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়। এই নির্বাচনগুলোতে খুব ছাপ্পা বা অনৈতিকভাবে তৃণমূল জিতেছে এমন অভিযোগ খুব বেশি নেই। সেখান থেকে কী এমন ঘটনা ঘটলো যে ২০১৬-র নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের পর দু'বছরের মধ্যে ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি সাধারণ মানুষের উপর আস্থা রাখতে পারলেন না। ৩৭ শতাংশ আসনে প্রার্থী দাঁড়াতে দিলেন না এবং বাকিটাতেও ছাপ্পা মেরে দখল করলেন। এবং বিরোধীপক্ষের জয়ী সদস্যদের ভয় দেখিয়ে ও প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে নিজ দলে শামিল করালেন? একটু পর্যবেক্ষণ করলেই কারণটা স্পষ্ট হয়ে যায়। নেতাদের একটা বড়ো অংশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছেন। দ্বিতীয়ত বড়ো নেতাদের একটা বড়ো অংশ পারিবারিক সূত্রে নেতা হয়েছেন। কোনোদিনই তাদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ ছিল না। আর তারা বুঝে গেছিলেন সময় খুব বেশি নেই, যে যত পারো আখের গোছাও। স্বাভাবিকভাবেই আখের গোছানোর প্রতিযোগিতা শুরু হলো এবং প্রতিযোগিতা যত তীব্র হলো সাধারণ মানুষের জীবন ততটাই

হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। আর এই নেতারা আখের গোছানোয় মনোনিবেশ করল কারণ তাদের সামনে না ছিল কোনো উচ্চ আদর্শ, না ছিল আরও বড়ো কোনো লক্ষ্য।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই তৃণমূল সিপিআইএম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ভাঙিয়ে নিতে শুরু করে। এরপর পঞ্চায়েত সমিতি, পুরসভা ও জেলাপরিষদ। যার সফলতম কদর্য প্রকাশ আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদ। যেখানে তৃণমূল একটি মাত্র আসন পেয়েছিল। কেশব চন্দ্র সেন একবার দুঃখ করে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বলেছিলেন যে তার সংগঠনটা ভেঙে যেতে বসেছে। এর উত্তরে পরমহংসদেব বলেছিলেন লোক পরখ করে না নিলে এমনই হবে। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরখ করা মানে তার মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া নয়। তার শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত কার্যকলাপ আতস কাঁচের নীচে রেখে পরীক্ষা করা। মৌখিক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করলাম তার কারণ সম্প্রতি একজন তৃণমূল বহিষ্কৃত আধা নেতা বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সামনে আর এস এস-এর প্রার্থনা ১৫ দিনের প্রচেষ্টায় মুখস্থ করে উপস্থাপন করে তার মন জয় করে নেয় বলে খবর। তিনি সাংসদ পদপ্রার্থী ছিলেন। সেকারণেই পরখটা কষ্টিপাথরেই যাচাই করা প্রয়োজন। এমন (এখানে উল্লেখিত নব্য বিজেপি) ব্যক্তির নিকট থেকে ভালো কিছু আশা করা উচিত নয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এমন রাজনীতিবিদ কম আছেন যিনি নিজের ক্যারিশ্মায় দলের ছত্রছায়া ছাড়া একটি জেলা পরিষদ আসন জেতার ক্ষমতা রাখেন। তাহলে অন্য দল থেকে নেতা ভাঙিয়ে আনার এত আগ্রহ কেন? নিজের দল ভারী করা নয়তো? মোদীজী একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমি একা দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারবো না।" দল যদি অন্য দলের বাতিল ও অত্যাচারী নেতাদের নিয়ে দলের বোঝা বাড়িয়ে চলে তাতে বিজেপির আদর্শ ও লক্ষ্য উভয়ই ব্যাহত হবে।

বিজেপির কাকে দরকার? বিজেপিতে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের। আমরা কিরণ বেদীকে দেখেছি। আমরা ভারতী ঘোষ, অনুপম হাজরাকেও দেখলাম। যাঁরা শোষিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত তাঁরা দু'হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। এত বুথ জ্যাম,

রাজনীতিতে দলবদল নতুন নয়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটি দল ভেঙে সমস্ত অচল নেতা আরেকটি (বিজেপি) দলে আশ্রয় নিলে নেতাদের অতীতের খারাপ কাজের দায় ও দুর্নাম দুটোই নতুন দলকে নিতে হবে। এটা বিজেপির পক্ষে সুখের ও শুভকর কখনোই হবে না।

ছাপ্পা, সন্ত্রাসের পরেও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ১৮টি আসন পেল। এই সংখ্যা ২৫ হলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ সাধারণ মানুষ চাইছে বিজেপিকে। এই পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করে তৃণমূল বিধায়ক ভাঙিয়ে সরকার ফেলতে চাইলে হিতে বিপরীত হতে পারে। বিশেষ করে জেহাদি মানসিকতার লোকগুলিকে দলে শামিল করলে। এই জেহাদি নেতাটির বিরুদ্ধেই বীরভূমের মানুষ দুধকুমার মণ্ডলকে ভোট দিয়েছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বীরভূমের ভোটারদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হবে। এটি মোটেই দল হিসেবে বিজেপির পক্ষে সুখকর হবে না।

১। তৃণমূলকে ফেলতে গিয়ে যে বিধায়ক বা জনপ্রতিনিধি বা নেতাদের বিজেপিতে নেওয়া হচ্ছে তারা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরা সুযোগসন্ধানী ইঁদুরমার্কা নেতা। জাহাজে জল ঢুকলে যেমন প্রথমে ইঁদুর পালায় তেমনি।

২। এই নেতাদেরই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে। আবার যদি সেই চেনা মুখ নতুন জামায় সজ্জিত দেখে তাহলে সাধারণ মানুষ নিশ্চিতভাবেই বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। লাভ হবে মৃতপ্রায় সিপিআইএম-এর।

৩। তাড়াহুড়োয় কিছু তৃণমূল এম এল এ-কে দলে নিয়ে সরকারটা ফেলে দিতে চাইলে বিজেপি-কে আটকানোর জন্য কংগ্রেস ও সিপিআইএম তৃণমূল সরকারকে সমর্থন করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এমন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বড়ো ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এবছর সিপিআইএম-এর ভোট বিজেপিতে (ট্রান্সফার হয়েছে) পড়েছে। একটু ধৈর্য ধরে সংগঠন করলে এই ভোটটাই বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক হয়ে উঠবে।

কথাগুলি বিজেপি নেতাদের হয়তো ভালো লাগবে না। মনোবেদনা থেকেই কথাগুলি লিখতে হচ্ছে। অনেকটা ঋষি অরবিন্দ যে কারণে নিঃস্বার্থভাবে ভালো বুঝে গান্ধীজীকে সাইমন কমিশনকে মান্যতা দিতে অনুরোধ জানিয়েছিল তেমনই। আরো কিছু বক্তব্য তুলে না ধরলে বিষয়টি সম্পূর্ণ হয় না।

বিজেপির তৃণমূলিকরণের সূত্রপাত মুকুল রায়ের হাত ধরে হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত ধুরন্ধর পারদর্শী রাজনীতিবিদ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি দীনদয়ালজীর একাত্ম মানবদর্শন আত্মস্থ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর একটা রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। আবার একইভাবে বিজেপির একজন ধুরন্ধর বাঙ্গালি রাজনীতিবিদ দরকার ছিল। উভয়ে উভয়কে ব্যবহার করেছেন এবং করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বিজেপি নেতৃত্বকে তাদের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ভুললে চলবে কেন? তিনি এখন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছেন। জ্বলাই স্বাভাবিক। কারণ যে দলটা তিনি নিজে হাতে গড়ে তুলেছিলেন সেখান থেকে তিনি নিজেই ব্রাত্য হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাই তিনি তৃণমূল ভাঙার খেলায় মেতে উঠবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-বিজেপির মাথায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের ভাবতে হবে কাদের নেওয়া ঠিক হবে, কাদের নয়। যারা বিজেপি কর্মীদের উপর এবং সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণের বুলডোজার চালিয়েছে তাদের নেওয়া হলে বিজেপির জনপ্রিয়তা অতি দ্রুত তলানিতে নেমে যাবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কারণে সাধারণ বিজেপি কর্মীদের মনে ধূমায়িত অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। অন্য দল থেকে আসা নেতারা কিন্তু পরীক্ষিত নয়, যেখানে সাধারণ বিজেপি কর্মীরা বহুভাবে পরীক্ষিত। তাদের নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার কিছু নেই।

বিজেপির রাষ্ট্রীয় কার্যকর্তারা মূলত

হিন্দিভাষী অঞ্চলের রাজনীতিটা খুব ভালো বোঝেন। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত তারা এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেননি। একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের নেতারা উত্তরবঙ্গটাকে ঠিকমতো চিনে উঠতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। দক্ষিণবঙ্গে সাংগঠনিক কাঠামো ততটা শক্তিশালী নয়, যতটা উত্তরবঙ্গে হয়েছে। তার প্রমাণ এবারের নির্বাচনে সবাই পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গে ৮-এ ৭টিই বিজেপির দখলে এসেছে। সে কারণে দক্ষিণবঙ্গে কোনো তথাকথিত হেভিওয়েট নেতার প্রয়োজন হলেও উত্তরবঙ্গে সংগঠনের কারণে তার প্রয়োজন হয় না। যেটা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতাদের বোঝানো কঠিন। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে কিছু তৃণমূলি গুন্ডা নেতার নাম ভাসছে, যারা নাকি বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে দিল্লিতে যোগাযোগ করছে এবং কিছুদনের মধ্যে তারা বিজেপিতে যোগদানও করবে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। আমার প্রশ্ন, সাধারণ কর্মীরা যদি সেই নেতাদের বাদ দিয়েই বিজেপিকে জেতাতে পারে তাহলে ভালো ফলের পরে সেই অত্যাচারী নেতাদের দলে নেওয়ার কি খুব প্রয়োজন আছে? কোচবিহারের একজন নেতা যিনি এক সময় তার পিতার দৌলতে ফরোয়ার্ড ব্লক করতেন। পরবর্তীতে তৃণমূলের অত্যাচারী নেতাদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন, তার অত্যাচারে সাধারণ বিজেপি কর্মীরা মিথ্যা মামলা ও চিকিৎসায় জরাজীর্ণ। বাস্তুচ্যুত। তাকে বিজেপিতে নেওয়া হলে মৃতপ্রায় সিপিআইএম কোচবিহার জেলায় পুনর্জীবন পাবে। একইরকমভাবে আলিপুরদুয়ার জেলায় যে কজন (৫/৬ জন) বিজেপির প্রতি খড়্গহস্ত ছিল তারা নাকি বিজেপিতে যোগদানের জন্য উপরতলায় যোগাযোগ করছে। বিজেপিতে তাদের স্থান হলে আলিপুরদুয়ারের মতো জেলায় বিজেপি তৃতীয় স্থানে পৌঁছে যাবে।

রাজনীতিতে দলবদল নতুন নয়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটি দল ভেঙে সমস্ত অচল নেতা আরেকটি (বিজেপি) দলে আশ্রয় নিলে নেতাদের অতীতের খারাপ কাজের দায় ও দুর্নাম দুটোই নতুন দলকে নিতে হবে। এটা বিজেপির পক্ষে সুখের ও শুভ কখনোই হবে না।

অতএব সাধু সাবধান। 'দিল বড়ো করলে দল বড়ো হবে' নিশ্চিত। কিন্তু বিষবাষ্পে ভরে উঠলে দীনদয়ালজীর আদর্শ রক্ষিত হবে তো? মনে রাখতে হবে, বন্যার পূর্বভাস পেলেই প্রথম যে জিনিসটা মজুত করতে হয় তা হলো পানীয় জল। কারণ বন্যায় চারিদিকে জল থৈ থৈ হলেও তা পানের উপযোগী থাকে না।

আশা করি আসন্ন বন্যার পূর্বাভাস বিজেপি পেয়েছে এবং তারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পানীয় জল সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করেছে। অন্যথায় ডায়েরিয়া, জন্ডিস এমনকী হেপাটাইটিসও হতে পরারে।

পরিষেশে বলি এটা আমার ব্যক্তিগত আশঙ্কা মাত্র। একজন সাধারণ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে যা দেখছি তাই লিখলাম। আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা কেউকেটা নই। সাধারণ বিজেপি সমর্থক। এবং তা আদর্শগত কারণেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, আমার এই ভাবনা বা পর্যবেক্ষণ ভুল প্রমাণিত হয়ে আগামীতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নেতৃত্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। ▮

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ও অমর্ত্য সেনের প্রলাপ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর মনক্ষুণ্ণ হয়ে বিশ্ববরেণ্য নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সম্প্রতি— 'মোদী ওউন পাওয়ার, নট ব্যাটল অব আইডিয়াজ' অর্থাৎ 'চিন্তাদর্শের যুদ্ধে নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জিতেছেন মোদী' শিরোনামে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রবন্ধে লিখেছেন— ''হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী বিজেপি লোকসভার ৫৪৩টি আসনের দায়িত্ব পেয়েছে। নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু এটা কী করে করলেন মোদী? আর প্রাচীন দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই বা কী করে মাত্র ৫২টি আসনে আটকে গেল?'

অমর্ত্য সেনকে তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সবিনয়ে কয়েকটি কথা জানাতে চাই— 'বছর কয়েক আগের চেয়ে বিজেপির একনিষ্ঠ সমর্থক আজ কী করে এতটা বাড়ল? প্রশ্নের উত্তরে বলি— মহম্মদ আলি জিন্নার পাকিস্তান দাবির সামনে মোহনদাস গান্ধীর কংগ্রেস দল মাথা নীচু করে সে দাবি মেনে নেয় এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট দলের প্রাণখোলা সমর্থনে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয়। দেশ ভাগের পরে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ-সহ পঞ্জাবে যেভাবে মুসলিম লিগের গুন্ডারা হিন্দুহত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ, নারীদের ধর্মান্তরকরণ করেছিল তা কোনো সভ্যদেশের ইতিহাস প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে সময় পঞ্জাবের পঞ্চনদের জল এবং পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা, যমুনা, বুড়িগঙ্গার জল হিন্দুর রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। কিন্তু তৎকালীন কী কংগ্রেস, কী কমিউনিস্ট কিংবা তথাকথিত বিদ্বজনেরা সেই হিন্দু হত্যার কোনো প্রতিবাদ করেননি। বরং মহাত্মাজী খুনিদেরকে আরও বেশি করে হিন্দু হত্যার মানসিক শক্তি জুগিয়েছেন। আজও হিন্দু হত্যা ও নির্যাতনের ধারা অব্যাহত। কাশ্মীর আজ হিন্দু শূন্য। পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে হিন্দুরা আক্রান্ত পদে পদে। এবং তা সংখ্যালঘু মুসলমানদের দ্বারা। এছাড়া চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনকালে রাজ্যে হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও হত্যা হয়েছে। আবার ২০১৩ সাল হতে রাজ্যে শয়ে শয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুটপাট, নারী নির্যাতন, গৃহদাহ হয়েছে শাসকদলের প্রশ্রয়ে মুসলমানদের দ্বারা। এ সমস্ত ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছোটোখাটো হিন্দু নির্যাতন লেগেই আছে। না, এজন্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ধারার রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বজনেরা কেউই দুঃখবোধ করেননি। শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে ভারতে সে সমস্ত অতি বামপন্থীরা যখন দিল্লির জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভারতকে টুকরো করতে চায়, কাশ্মীর, মণিপুরের আজাদি চায় আর সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলনে কমিউনিস্ট সীতারাম ইয়েচুরি, কংগ্রেস প্রধান রাহুল গান্ধী ও কেজরিওয়াল উপস্থিত হয়ে তা সমর্থন করেন তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা আতঙ্কিত হয় বইকি। দেশ ভাগের সময় থেকে বামপন্থী, যুক্তিবাদী, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্বজনদের নষ্টামি এবং ভণ্ডামি দেখতে দেখতে হিন্দুদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তাই দীর্ঘদিনের ছন্নছাড়া হিন্দুরা আজ জোটবদ্ধ হচ্ছে দেখে আপনি আতঙ্কিত দুঃখিত। হিন্দুদের জোটবদ্ধ হওয়ার কারিগর নরেন্দ্র মোদী। এজন্য তাঁর ধন্যবাদ পাওয়া উচিত। ▮

মোদী ম্যাজিকে মিরাকেল ঘটাচ্ছে শেয়ার বাজার

পার্থসারথি গুহ

একটা সময় ভারতীয় অর্থবাজারে থরহরিকম্প জাগাতো শেয়ার ধস নামক শব্দটি। প্রায়শই শোনা যেতো বাজারে নাকি মহাপতন ঘটেছে। নিফটি আর সেনসেক্স নামক দুই মানিকজোড় তাতে কুপোকাত হয়ে পড়তেও সময় নিত না। এই প্রবণতাটা ২০১৪ পর্যন্ত চলেছে নিয়ম করে। তারপরেই ভারতবর্ষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সারা দেশজুড়ে উঠল নমো ঝড়। দিল্লির গদিতে বসলেন নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদী। ব্যস, সারা দেশটাই আমূল যেন পালটে যেতে লাগল কোনো এক জাদুস্পর্শে। জিডিপি জানান দিতে থাকল ভারত সত্যি বাড়ছে। বৃদ্ধির অন্যতম সূচক শেয়ারবাজার হয়ে উঠল সাবালক। মোদী আসার আগে পর্যন্ত যে নিফটি সূচক সাড়ে ৫ হাজার আর সেনসেক্স ১৬-১৭ হাজারের ঘরে ঘুরছিল। তাই গত ৫ বছরে অতিক্রম করল বিশাল একটা পথ।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলে বেরনোর আগে থেকেই শেয়ার ইনডেক্স বুঝিয়ে দিচ্ছিল প্রত্যাবর্তন ঘটছে নমো-২ সরকারের। সে সময় ১১,৮৫০ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল নিফটি। সেনসেক্সও তখন ৪০ হাজার ছাপিয়ে গেছে। তাপরের ঘটনা তো ফের ইতিহাস ঘটাল এ ভারতবর্ষে। বিরোধীদের মুখে ছাই দিয়ে, যাবতীয় সমালোচনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরলেন গত ২৩ মে। নোটবন্দি, জিএসটি, আর্থিক সংস্কার ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য মোদীজীর একের পর এক পদক্ষেপ এই জয়কে ত্বরান্বিত করল। তার ওপর সারা বিশ্বে কূটনৈতিকভাবে কৌলিন্য পেল মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত। আর হ্যাঁ, এই অবসরে নিফটি মহারাজও পেরিয়ে যায় ১২ হাজারের মাইলস্টোন। সেনসেক্সও ৪১ হাজারের গণ্ডিকে অতিক্রম করল অবলীলাক্রমে। গত পাঁচ বছরের নিরিখে নিফটি দ্বিগুণের বেশি ও সেনসেক্স ৩ গুণের কাছাকাছি বেড়েছে। যা শুধুমাত্র মোদী সরকারের স্বচ্ছ অর্থনীতির জন্যই সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। আগামী ৫ বছরে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা প্রবল করে তুলেছে। সেদিক থেকে দেখলে আগামী ৫ বছরে অর্থাৎ ২০২৪ এ গিয়ে ভারতীয় নিফটি ২০ হাজার ও সেনসেক্স ৬০-৭০ হাজারের কাছে গেলে মোটেই অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না।

চীনের একচ্ছত্র আধিপত্যেও ভাগ বসিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর শাসনাধীন ভারতভূমি। বস্তুত, ভারতীয় শেয়ার বাজারেও সেই চৈনিক লগ্নি পুরোপুরি ভাগ জমাতে শুরু করেছে এফ আই আইদের হাত ধরে। এর সঙ্গে রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশের পাশে দাঁড়ানোও বিশাল ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশিদের পাশাপাশি যোগ করতে হবে ভারতীয় ফান্ড বা ডিআইআইদের লগ্নিকে। এখন বিদেশিরা বেচলেও ভারতীয় শেয়ার বাজারকে কিছুতেই পড়তে দেন না ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড। ভারতের অর্থবাজারে বেশ কিছু কোম্পানি রয়েছে যারা ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করে চলেছে। যথারীতি বাজারে মাথা উঁচু করে টিকেও আছে তারা। এমন কোম্পানি সত্যি বলতে হাতে গোনা যারা বছরের পর বছর ধরে লাগাতার শেয়ার গ্রহীতাকে লাভবান করে চলেছে। এদের আরও একটা দিক থেকে বিচার করতে হয়। সেটা হলো

এদের ডিভিডেন্ড দেবার প্রবণতা থেকে। অনেক সময়েই দেখা যায় এসব উন্নতমানের শেয়ার শুধুমাত্র বোনাস ও ডিভিডেন্ড দিয়ে দিয়ে তাদের ক্রেতাদের ভরপুর করে তোলেন। যে সুযোগটা মোটেই মেলে না 'কালকের যোগী' শেয়ারগুলির ক্ষেত্রে। এজন্যই বিশেষজ্ঞরা পই পই করে বলে থাকেন উন্নত মানের শেয়ার কেনার কথা। আর দুদিনের চাঁদনি ছড়ানো শেয়ার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নিয়ে (বলা ভালো ফাটকা করে) বেরিয়ে যাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ।

গত এক-দু বছরে নতুন উচ্চতায় চড়ার যে অভ্যেস রপ্ত করেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার, তার কাছাকাছি জায়গাটা হলো ১২ হাজার। সেনসেক্সও পেল পুরনো উচ্চতা ছুঁয়ে দেখার ঝাঁঝ। এখন ১২ হাজারের ওপরে থাকা প্র্যাক্টিস করতে হবে নিফটি মহারাজকে। এরপরের জংশন যে ১৩ হাজার সেটা বোঝার জন্য হয়তো খুব একটা বোদ্ধা হতে হবে না। কিন্তু তার আগে পার্টি যাতে ভেস্তে না যায় সেদিকটাতেও চোখ রাখতে হবে খুব স্বাভাবিকভাবেই। আবার সূচকের এই লম্ফঝম্প কেন ও কতদিন তার স্থায়িত্ব, সেটাও একটা বড়ো ব্যাপার। এই মুহূর্তে বিশ্ব বাজারের নিয়ম করে ওপরে থাকা, ক্রুড অয়েলের দাম নীচে নামা ও বিদেশিদের পুনরায় ক্রেতার ভূমিকা নেওয়া এই ত্র্যহস্পর্শ বাজার বাড়তে সাহায্য করছে। তার ওপর মোদী ম্যাজিক তো আছেই।

এত কিছুর মধ্যেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বহু ভারতীয় কোম্পানি, কিন্তু কোয়ার্টার অনুযায়ী লাভের মাত্রা বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে তাদের শেয়ারের দামে। গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা ও গাড়ির অনুসারী শিল্প সম্পর্কিত বহু শেয়ার এই দু-এক বছরে বেলাগামভাবে বেড়ে চলেছে। বিশিষ্ট শেয়ার বিশেজ্ঞরা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন এই সেক্টরের ইতিবাচকতা নিয়ে। যাঁরা তাঁদের কথা শুনে বাধ্য ছাত্রের মতো এসব শেয়ার কিনে তাঁদের ডিম্যাট ভরেছেন তাঁরা আজ লাভের মুখ দেখছেন।

এই মুহূর্তে ভারতের অর্থবাজার যেমন লড়াই করছে নিফটির ওপরে থাকা নিয়ে। আগের উচ্চতার খুব কাছে ঘোরাঘুরি করছে ঠিকই, কিন্তু এমন কোনও ইতিবাচক ব্রেক আউটও হয়নি যার জোরে বুক ঠুকে বলা যায় নিফটি নতুন রেকর্ড তৈরি করতে যাচ্ছে। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে এমন কিছু অঘটন ঘটে যায়নি, যার ওপর নির্ভর করে বলা যায় বাজার খারাপ জায়গায় চলে গেল। খুব ছোটো একটা জোনের মধ্যে নিফটি প্রায় মাসখানেক ধরে আটকে রয়েছে। তার ওপরের দিকটা যদি ১২ হাজার হয়, তবে নিশ্চিতভাবে নীচের জায়গাটা হলো ১১,৬০০। ৪০০-৫০০ পয়েন্টে সীমাবদ্ধ নিফটির এই ঘোরাফেরা। যথারীতি সেনসেক্সও এই ঘূর্ণি চক্করের মধ্যেই আছে। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার, নিফটি যদি ১১,৯০০ পার হয়ে চলতে পারে ও দুটো ক্লোজিং এই জায়গায় দিতে পারে তাহলে আরও অনেক বিস্তৃতি ঘটবে এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকের। আর ১১,৬০০ ভেঙে ট্রেড করতে থাকলে নিফটি কিছুটা নিচে চলে যাবে। যদিও বিশেষজ্ঞদের বড়ো অংশের বক্তব্য বাজার এখন বিরাট কিছু নিচে আসবে না। বরং আরও ওপরে যাওয়ার ম্যারাপ বাঁধার প্রক্রিয়া চলবে বেশ কিছুদিন।

বাজার যখন বাড়তে থাকে তখন একটা চালু কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে— স্কাই ইজ দ্য লিমিট। এমনিতে একটা কথা আবার ভারতের বাজারের সম্পর্কে শোনা যায়, সেটা হলো এখানকার লগ্নিকারীরা যতই লাভে থাকুন আর তাঁদের হাতের শেয়ার যতই বেড়ে যাক না কেন কিছুতেই বেচতে চান না তাঁরা। অথচ সেই একই মানুষ যদি দেখেন কোনও শেয়ার তার সর্বোচ্চ অবস্থানকে ছাপিয়ে ক্রমে বেড়েই চলেছে তখন তাঁরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সেখানে কিনতে যান। এটাকে যদি দোষ বলা হয় তবে তাই। তবু এই 'টিপিক্যাল' প্রথা কিছুতেই ছাড়তে চান না ভারতের লগ্নিকারীরা। সূচক একেবারে টঙে বসে আছে, এই অজুহাত দেখিয়ে অনেকেই হাত লাগাতে চাইছেন এই বাজারে। ফলে ওপর-নীচের এই টানাপোড়েনের মাঝে পড়ে বাজার বড্ড পরিশ্রান্ত হয়ে উঠছে। বুল-যোদ্ধাদের এই রণক্লান্ত অবস্থানের সুযোগ নিতে চাইছেন বেয়ারারা। এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু তাঁদের আবার নড়াচড়া করতে দিচ্ছে না বুলরা।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে ২০১৭ -র শুরু আর শেষে বেশ কিছু তফাত গড়ে দিয়েছে। যা ২০১৮-য় শেয়ার বাজারকে মসৃণ থাকতে দেয়নি। সূচক ওপরে ওঠা সত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে থেকেছে সকলের ভারী পছন্দের মিডক্যাপ। সেদিক থেকে ফের ২০১৯ নতুন করে উজ্জীবিত করতে শুরু করেছে সূচকজোড়কে। সেক্ষেত্রে নিফটির জন্য ওপরের দিকে সাড়ে ১২ হাজার শক্ত চ্যালেঞ্জ। আবার নীচে খুব ভালো সাপোর্টের জায়গা আপাতত ১১,৫০০-১১,৭০০ বলেই মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে মুনাফা লাভের তাগিদে বাজার পড়লেও, বারবার তা ঠেলেঠুলে ওপরে চলে আসবে। যারা নিয়ম করে ট্রেড করেন, তারা একটু সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স মেনে কাজ করলে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকছে ভরপুর। ▮

ভ্রম সংশোধন

স্বস্তিকার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ সংখ্যার প্রচ্ছদে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী বিজেপির জয়ন্ত রায়ের ছবি ভুল ছাপা হয়েছে। সঠিক ছবিটি ওপরে দেওয়া হলো। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

—স. স্ব.

চিঠিপত্র

মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, গর্বিত সারা বিশ্ব

'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন বিপুল জনাদেশ নিয়ে। এ সৌভাগ্য শুধু ভারতের নয়, বিদেশেরও'— বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প। নরেন্দ্র মোদী যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকলে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক হবে মধুর। তাই নরেন্দ্র মোদীর কৃতকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে উত্তরপ্রদেশের এক মুসলমান দম্পতি তার ছেলের নাম রেখেছেন নরেন্দ্র মোদী। যেহেতু তার জন্ম ২৩ মে। এতে নাকি তাদের সন্তান হবে নরেন্দ্র মোদীর মতো গুণী। মুসলমান পরিবারে এমন একটি বেনজির দৃষ্টান্ত প্রতিটি দেশভক্ত মানুষের প্রেরণাস্বরূপ। এতে প্রমাণ হয় এদেশের সব মুসলমানরাই কিন্তু খারাপ নয়। অনেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে শ্রদ্ধা করে। কিছু নেতা-নেত্রী তাদেরকে উসকে দিয়ে মাথা নষ্ট করে। এর আগেও শুনেছি অনেক মুসলমান পরিবার রামমন্দির করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছে। তিন তালাক বাতিল করার নীতিকে অনেকে সমর্থন জানিয়েছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা তাকিয়ে আছে এই মহান নেতার সহানুভূতির ছাতার তলায় আসতে। ওদেশের হিন্দুদের বক্তব্য ভারতে নরেন্দ্র মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রী হলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্য তারা সুখে থাকবে। আমরা ভারতবাসী এমন একজন নেতার ছায়াতলে থাকার সুবাদে গর্ববোধ করছি।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণ

সম্প্রতি লোকসভা ভোটের ফল প্রমাণ করলো মোদীজী এখনো দেশের অপ্রতিরোধ্য নেতা। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ফল সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে এই রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের এর তত্ত্ব তুলে ধরেছেন যা সম্পূর্ণ অবান্তর। শেষ আট বছর এ রাজ্যে এক অগণতান্ত্রিক সরকার আছে। এখানে বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ নেই, ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই, ভোটে জিতেও তাদের শাসক দলে যুক্ত হতে হয়, না হলে মিথ্যা কেসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। তাই একদিকে সন্ত্রাস অন্যদিকে মোদীজীর মুখ দুই মিলে এ রাজ্যে পদ্ম ফুটিয়েছে। তার ওপর রাজ্যের সমস্ত স্তরের বিজেপি কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। শুধু ধর্মীয় মেরুকরণে ভোট হলে তৃণমূল একটিও আসন পেত না।

আসলে মেরুকরণ যা হয়েছে সেটা হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের। রাজ্যের ভোটাররা বুঝেছেন বাম বা কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে ঘুরিয়ে টিএমসি-কেই দেওয়া। অনেকে বলছেন বামেদের ভোট নাকি রামে গিয়েছে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, ভোটার কারোর ব্যক্তিগত হয় কি? বাম ভোট, টিএমসি ভোট এগুলো কি বাস্তবে হয়? এই ধরনের ভোট হলে পরিবর্তন বলে কিছু থাকতো না। একথা ঠিক যে বিরোধী হিন্দু ভোটই বেশিরভাগ বিজেপি-তে গিয়েছে, কিন্তু সেটা মেরুকরণের জন্য নয়। মুসলমান সমাজকে এমন করে বিজেপির ভূত দেখানো হয় যেন কোনও বিজেপি শাসিত রাজ্যে মুসলমান নেই।

এটা খুব সত্যি যে, এই রাজ্য তৃণমূলের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ আর নেই। এইবার হয়তো তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা গণতন্ত্রের অনেক ভালো কথা বলবেন। যেমন ভোটে হেরে মদনবাবু বললেন, প্রার্থী দলের কিন্তু জনপ্রতিনিধি সবার। কিন্তু এই কথাগুলো আগে ওদের মনে ছিল না। আর কেন্দ্রের টাকায় বিভিন্ন প্রকল্পকে নিজেদের নামে চালিয়ে ভোট পাওয়া যায় না।

—পদ্মপ্রিয় পাল,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

মমতার গালে গণতন্ত্রের থাপ্পড়

গণতন্ত্রের থাপ্পড়টা শেষ পর্যন্ত দিদির গালেই পড়লো, আর এখন নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানবেন, না পদত্যাগ করবেন? আমার মনে হয় দিদি যা বলেন তাই করেন। সুতরাং তাঁর পদত্যাগ করাই উচিত। তাহলে কথাও থাকলো আর মানও বাঁচলো। এটাতো সাধারণ মানুষের কথা। এবার দিদির নির্বাচিত প্রার্থীদের কথায় আসা যাক। দিদি বলেছিলেন প্রত্যেককে যে যার কেন্দ্রে লিড নিতে হবে অর্থাৎ আগের তুলনায় বেশি ভোট পেতে হবে। তারা নেত্রীর কথাকে বেদ বাক্য মানে। তারা জানে দিদি একবার যেটা বলে তার থেকে নড়চড় হয় না— এ ব্যাপারে দিদি খুবই কঠোর। তাই তারা ভাবছেন বিজেপি দলেই নাম লেখাই যদি সেখানে টিকিট পাওয়া যায়। যদিও বিজেপি নেবে কিনা সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। লোকসভার ফলাফলের নিরিখে ১২৯টা বিধানসভা কেন্দ্রে আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পিছিয়ে পড়েছেন তাহলে দিদির কথা মতো ১২৯ জন এমএলএ টিকিট পাচ্ছেন না। নরেন্দ্র মোদী এক সভায় ৪০ জন এমএলএ নিয়মিত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলাতে দিদি খুব রেগে গিয়ে মিথ্যুক, কান ধরে ওঠবোস করিয়ে চড় থাপ্পড় মারবেন বলেছিলেন। তাহলে এখন দলটা তুলে দিয়ে তুলসীর মালা নিয়ে রাম নাম জপ করতে করতে বিজেপিতে যোগ দেবেন, না কাশীবাসী হবেন? পাপ স্খলন করার জন্যে?

—সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া।

সিন্ধু ও হিন্দু শব্দের উৎপত্তি

সংবাদে প্রকাশ, হিন্দু নাম দিয়েছিল মুঘলরা, মন্তব্য কমল হাসানের। তাঁর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কিছু বলতে চাই।

আমরা জানি, সপ্ত অহনের সমাহার

সপ্তাহ হয়, ঠিক সেভাবে সপ্ত বিন্দুর সমাহার সিন্ধু বা উচ্চারণ ভেদে সিন্ধু। এখানে বিন্দু বলতে বুঝতে হবে জলবিন্দু অর্থাৎ নদী। সম্ভাব্য বিন্দু বা নদী হচ্ছে কাবুল, ঝিলম, চন্দ্রভাগা, রাভী, বিপাশা, শতদ্রু ও সিন্ধু নদ। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দআবেস্তায় হিন্দু বা হিন্দ নামটি রয়েছে। আবার ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য বেদে 'সরিতো' কে 'হরিতো' এবং 'সরস্বত্যো' কে 'হরিস্বত্যো' বলা হয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পার্সিদের মতো ভারতীয়রাও ক্ষেত্রবিশেষে 'স' কে 'হ' ধ্বনি রূপে উচ্চারণ বা লিপিবদ্ধ করতেন। আবার ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে 'হ' বা 'স' ধ্বনি এক দুর্বল ধ্বনি, ক্ষেত্রবিশেষে এটি শব্দের সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ ঘটায়। যেমন— বোন হয়েছে বহিন এবং মালদহ হয়েছে মালদা, সপ্তাহ হয়েছে হপ্তাহ। বিজ্ঞানীদের মতে সংস্কৃত এবং প্রাচীন পার্সি ভাষা মূলত আর্যভাষা।

উল্লেখ্য, প্রাচীন জেন্দআবেস্তা যখন রচিত হয় তখন ইসলামের জন্ম হয়নি। অর্থাৎ প্রাচীন পার্সি ভাষা আরবি ভাষার সংস্পর্শে আসেনি। আমরা জানি, শব্দ বা ভাষা হচ্ছে বহতা নদীর মতো যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিবর্তিত হতে থাকে। এই বিবর্তন নিম্নভাবে লেখা যায় : বিন্দু—সিন্দু—সিন্ধু—হিন্দু।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

দেশভাগ বিরোধী আল্লাবক্স সমরু

মে মাসের ১৪ তারিখে দেশভাগ বিরোধী এক মহান দেশপ্রেমিকের মৃত্যুদিন। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ১৬৫ কোটির (ভারত ১৩০, পাকিস্তান ১৮, বাংলাদেশ ১৭) কতজন মানুষইবা জানেন এই মহান দেশপ্রেমিকের কথা। জানি না পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুরে তাঁর কবরে গিয়ে কেউ একটা পুষ্পস্তবক দিয়ে চোখের জলে তাঁর কবর সিক্ত করেছেন কিনা! ১৯৪০-এর ২২ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর কিছু মুসলমান নেতা পাকিস্তানের দাবি এবং ইসলামের ভিত্তিতে দেশভাগের বিরোধিতা করে ২৭ থেকে ২৯ এপ্রিল দিল্লিতে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মুসলমান সংগঠন এতে যোগদান করে। তাদের সংগঠনের নাম দেওয়া হয়— আজাদ মুসলিম কনফারেন্স। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রায় ৫০,০০০ মুসলমান জনতার বিপুল সমাগম দেখে তা এক দিন বাড়াতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সম্মেলন চলে। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়— 'এই সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, যে প্রস্তাব ভারতবর্ষকে হিন্দু ভারত এবং মুসলমান ভারত হিসেবে দ্বিখণ্ডিত করতে চায় তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এ ধরনের প্রস্তাব সাধারণ ভাবে ভারতীয় জনগণের বিশেষ ভাবে মুসলমান সমাজের জন্য অত্যন্ত হানিকর।' এই সম্মেলন বানচাল করতে মুসলিম লিগ হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করেও কৃতকার্য হতে পারেনি। সম্মেলনের কর্মকর্তাদের যুক্তি ছিল ভারতবর্ষে মুসলমানদের বহু তীর্থস্থান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন আজমির শরিফ, দিল্লির জামা মসজিদ, কলকাতার নাখোদা মসজিদ। তাছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন মসজিদ এবং মুসলমান পির-ফকিরদের কবর ও মাজার। তাছাড়া দেশবিভাগ হলে ভারতের সব মুসলমানকে যদি হিন্দুরা বিতাড়িত করে পাকিস্তানে চলে যেতে বলে তা কি সম্ভব হবে! এখানে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে দেশভাগ-বিরোধী সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো কেন? কথাটা অপ্রিয় হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, যাদের আজাদ মুসলিম কনফারেন্স নেতৃত্ব স্বাভাবিক বন্ধু ভেবেছিল সেই কংগ্রেস নেতাদের চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা। তারা এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অগ্রাহ্য করে মুসলিম লিগের নেতা জিন্নার পদতলে নিজেদের সমর্পণ করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যে ফজলুল হককে দিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল তিনিও পরে বুঝেছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টি করে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও লাভ হবে না। বিশেষত বাঙ্গালি মুসলমান তিন দিক দিয়ে হিন্দু ভারত দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকবে। এইজন্য লিগ নেতারা ফজলুল হককে গদ্দার বলতেও দ্বিধা করেনি। দিল্লির এই দেশভাগ বিরোধী সম্মেলনে বঙ্গপ্রাপ্ত থেকে হুমায়ুন কবীর এবং ড. আর আহমেদের নেতৃত্বে একদল মুসলমান যোগদান করেন। দেশভাগ বিরোধী এই সংগঠনের প্রধানহোতা ছিলেন সিন্ধুপ্রদেশের দু'বারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আল্লাবক্স সমরু। তিনি বিশাল জমিদারপুত্র হয়েও সবসময় খদ্দরের তৈরি পোশাক পরিধান করতেন। ১৯৪৩ সালের ১৪ মে শিকারপুর শহরের উপকণ্ঠে টাঙ্গায় চড়ে বাড়ি ফেরার পথে মুসলিম লিগের ভাড়াটে খুনিরা রিভলভার থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করে। গোয়েন্দা বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে এই হত্যার সঙ্গে সিন্ধু প্রদেশের মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দের যোগাযোগ সূত্র পাওয়া গেলেও কোনো আসামি ধরা পড়েনি, হত্যার কোনো বিচারও হয়নি। মুসলিম লিগের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১০ হাজারের বেশি মুসলমান তার জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করে। দেশভাগ বিরোধী মুসলমান নেতাদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং খান আব্দুল গফফর খান ছাড়া অন্য কোনো মুসলমান নেতার নাম জানা যায় না। তুবও আজ বেদনাহত চিত্তে বলতে বাধ্য হচ্ছি এই মহান দেশপ্রেমিক মুসলমান নেতার প্রতিকৃতি যাতে ভারতীয় পার্লামেন্টে স্থাপিত হয় তার জন্য আমাদের সকলের সচেষ্ট হবার বিশেষ প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত আজ তিনি পারিবারিক কবরখানায় শায়িত আছেন। সেখানে শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব নয়। তাঁর মৃত্যুদিনে সুদূর কলকাতা থেকেই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

নারীসত্তা পরিবারের গর্ব

পাঞ্চালী দে

একজন নারী তার নারীসত্তাতেই পরিপূর্ণ। নারী এই শব্দটির সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে অনেক গুণের সমাহার সম্পন্ন এক অস্তিত্ব। নারী ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। সৌন্দর্যের প্রতীক। দয়া আর মায়ার জীবন্ত উদাহরণ। এছাড়াও নারী সহনশীলতা, ক্ষমা, উদারতা, ভালোবাসা, প্রেম, কোমলতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা গুণ সম্পন্না। এসবের সঙ্গেই হাসির আড়ালে কান্না লুকানোর ক্ষমতা এবং মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা নারীকে আপন মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। তার সঙ্গে মাতৃত্বের একচ্ছত্র অধিকার— নারীকে প্রকৃতির অদ্বিতীয় সৃষ্টি হিসেবে গর্বিত করেছে।

জন্মসূত্রে পাওয়া গুণাবলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটি কন্যা সন্তান স্বাভাবিক ভাবেই একটি পুত্র সন্তানের চাইতে তুলনায় একটু বেশিই ধীর, স্থির হয়। ধৈর্য ও সহনশীলতায়ও মেয়েরা এগিয়ে থাকে ছোটোবেলা থেকেই। তাই অনেক ক্ষেত্রে ভাইটির চেয়ে বোনটি ছোটো হলেও ছোটাছুটি কম করে। বাচ্চাদের স্বাভাবিক যে চঞ্চলতা, সেটাতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা একটু কমই থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই বাবা-মায়ের ওই মেয়ে সন্তানটির জন্য উদ্বেগও কম থাকে। এতসবের পরও নারী আপন মহিমায় গৌরবান্বিত। কারণ নারীর আঁচলেই যে বাঁধা আছে দয়া, মায়া, উদারতা, অল্পেই সন্তুষ্টি, ভালোবাসা আর প্রেমের মতো মহৎ গুণগুলি। যে গুণগুলি প্রত্যেক মানুষের মতোই নারীদেরও একান্তই ব্যক্তিগত। তবু এই গুণগুলির প্রকাশ এবং প্রয়োগ নির্দ্বিধায় পুরুষের চেয়ে অনুপাতে বেশি নারীর ক্ষেত্রে। আবার এটাও সত্যি যে নারীরা এই গুণগুলির যথাযথ প্রয়োগ করলেও সমান মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। তবে ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। তবু নারীরা তাদের মজ্জাগত বিশেষ গুণ 'অল্পেই সন্তুষ্টি'কে হাতিয়ার করে সমস্ত না পাওয়ার কষ্টগুলো হাসি মুখে মেনে নেয়।

আসলে নারী সংসারে থেকে সংসারের ভালো মন্দের দায়ভার কখনওই এড়াতে কোনও পন্থা অবলম্বন করে না। তাই নারী অনন্যা। শুধু সামাজিক বা পারিবারিক দায়িত্বই নয়, নারী পারে এভারেস্ট জয় করতে, পারে মহাকাশ অভিযান করতে। পারে সীমান্ত সুরক্ষায় পুরুষ সৈনিকদের সঙ্গে সমান তালে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে। কারণ নারী তার স্বভাব গুণেই যে কোনও পরিস্থিতিকে জয় করতে পারে। আজ এমন কোনও কর্মক্ষেত্র নেই যেখানে নারীর উপস্থিতি নেই। তাই আজ আর কোনও ভাবেই নারীকে তার যোগ্য এবং উপযুক্ত স্থানে অধিষ্ঠিত করা থেকে কেউ বিরত করতে পারবে না।

প্রকৃতির যে দানে নারী পূর্ণ, অতুলনীয়, শ্রেষ্ঠ, সেই মাতৃত্বও নারীর এক পবিত্র সত্তা। অদ্বিতীয়া এই নারী সত্তার গুণেই নারী পুত্র সন্তান রূপে পুরুষ সত্তার সৃষ্টি করে, কন্যা সন্তান রূপে মাতৃ সত্তার সৃষ্টি করে। এভাবেই জীবনরূপী চক্র আবর্তনের দায়িত্ব নারীর কাঁধেই থাকে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় পৃথিবীকে অমর করে রাখার যে দায়ভার নারীজাতির কাঁধেই রয়েছে। তার জন্য নারী অবশ্যই স্যালুট পাওয়ার যোগ্য। কেননা মাতৃরূপে নারী তার গর্ব ও অহঙ্কারের, কারো সহধর্মিণী হিসেবে নারী এক মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। নারীর জন্যই স্বামীরূপী পুরুষটি পিতৃত্বের গর্ব অনুভব করেন। স্থায়ী একটা সম্পর্ক, সন্তান, সুখ, নিজস্ব প্রজন্ম তো পানই, তার সঙ্গে সৃষ্টি সুখের অংশীদার, যেটি অনন্য প্রাপ্তি।

আজ পুরুষদের অনেকেই এই কঠিন সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং পারছে। তবু বাকিটার জন্য উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। কেউ ছোটো নয়, কেউ বড়ো নয়। উভয়ের সমান প্রয়োজনেই একে অন্যের সম্মান করা প্রয়োজন। পুত্র সন্তানটিকে শেখানো দরকার যে, নারীজাতিকে অসম্মান নয়, তাকে পূজার মনোভাব নিয়ে সম্মান জানাতে। কেননা নারী জগজ্জননীর প্রতিভূ। তবেই প্রকৃত অর্থে নারী হবে সবার গর্বের। নারী সত্তা থাকবে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। ■

সুস্থ থাকতে কী কী করবেন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

● ভিটামিন-সি কে বলা হয় মিরাকেল ড্রাগ। (লেবু, পেয়ারা, আঙ্গুর, শশাতে ভিটামিন সি বেশি থাকে)।

● রসুন ডায়বেটিস রোগীর ব্লাডসুগার কমায়। এমন কোনও রোগ নেই যা রসুন আরোগ্য করতে পারে না।

● কচি আমপাতার রস ১ চামচ করে খেলে সুগার কমায়। সঙ্গে পেয়ারা পাতা (নরম) চিবিয়ে খাবেন। দাঁত ভালো থাকবে, সেই সঙ্গে সুগার দূর হবে।

● সুগার রোগী করলার রস, কলা, থোড়ের রস অবশ্যই খাবেন।

● ধূমপান থেকে দূরে থাকবেন। মদ ছোঁবেন না।

● শরীর হাল্কা রাখতে, দীর্ঘ জীবন লাভ করতে, চক্ষুরোগ থেকে মুক্ত থাকতে টমাটো খান। টমাটো খেলে দাঁত, চোখ, ত্বক ও নাক ইত্যাদি ভালো থাকে। প্রতিদিন একটি করে টমাটো খেলে ডাক্তার ডাকতে হবে না।

● লেবুর রস ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে পান করুন। নুন বা চিনি দেবেন না। প্রতিদিন খাবারে লেবুর রস খাবেন।

● প্রতিদিন সকালে ৫/৬টি থানকুনি পাতা খাবেন। আমাশয় হবে না। স্মৃতিশক্তি বাড়বে।

● রান্নায় যেন কুলেখাড়ার পাতা, শুসনিশাক ও হিংচা শাক থাকে। যদি কলমিশাক দিতে পারেন খুবই ভালো।

● লাল নটে শাক বেশি করে খাবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দূরে থাকবেন।

● প্রতিদিন ৩/৪ লিটার জল পান করুন। কমপক্ষে ৭ ঘণ্টা ঘুমান।

● যদি শোয়ার সময় ২ গ্লাস জল ও সূর্য ওঠার আগেই ২ গ্লাস জল খালি পেটে পান করতে অভ্যস্ত হন তবে সহজে কোনও কঠিন রোগ হবে না।

● বেশি আমলকি খান। পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা বেশি করে খান।

● আপেল খোসাসহ খাবেন। স্যালাড বেশি খাবেন।

● পাকা মিষ্টি কুমড়ো বেশি পরিমাণে খেলে কিডনি রোগ সহজে আসবে না।

● মুখের বামপাশ দিয়ে চিবিয়ে খাবেন তাতে দেরি লাগুক কিন্তু চিবানো ভালো হবে। বেশি রাত্রি জাগবেন না।

● পাঁচ মিনিটের হো হো করে হাসি পাঁচদিন করে আয়ু বাড়িয়ে দেয়।

● প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জলখাবার, দুপুরের ও রাত্রের আহার করুন।

● ত্রিফলাকে বন্ধু করুন। পেট পরিষ্কার রাখুন। কোষ্ঠকাঠিন্য সব রোগের মূল। প্রয়োজনবোধে রাত্রে শোয়ার আগেই জল দিয়ে খান।

● জলখাবারের আধ ঘণ্টা ও আহারের ১ ঘণ্টা পর জল পান করবেন।

● চপ ও সিঙ্গাড়া থেকে দূরে থাকবেন। দুধ চিনি দিয়ে খাবেন না, লবণ কম খাবেন। বেশি করে গাজর খাবেন। আদা বেশি খাবেন (ক্ষুধা বেশি হবে)।

হেলথ্ চেক-আপ করিয়ে নেবেন। আপনার শরীরে কী ঘাটতি আছে জানতে পারবেন।

● বেশি করে সাইকেল চালাবেন ও সাঁতার কাটবেন।

● বেশি করে সবজি খান। বেশি পরিমাণে পালংশাক খাবেন।

● বেশি করে পেঁপে খাবেন। প্রতিদিন পেঁপের যেন একটা তরকারি থাকে।

● কিছু সময় সকালে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে পারলে খুবই ভালো।

● যতটা সম্ভব তৈল ও মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

● সপ্তাহে ১ দিন চিরতা পাতার রস খাবেন।

● প্রতিদিন ৪/৫টি তুলসীপাতা চিবিয়ে খেলে খুবই ভালো।

● মুদ্রার সাহায্যে রোগ সারান।

● প্রতিদিন প্রাণায়াম করুন।

● শরীরে যখন কোনো অসুবিধা দেখা দেবে সঙ্গে সঙ্গে সারাবার ব্যবস্থা নিন, ফেলে রাখবেন না। একটুও দেরি করবেন না। ■

মমতার আচরণে ভারসাম্য হারানোর লক্ষণ স্পষ্ট

সন্দীপ চক্রবর্তী

ভাটপাড়ায় জয় শ্রীরাম ধ্বনির পর (ফাইল চিত্র)

ভোটে গোহারান হেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন? সাম্প্রতিক দুটি ঘটনায় সেই লক্ষণ কিন্তু স্পষ্ট! প্রথম ঘটনাটি নির্বাচনের কিছু আগের। মেদিনীপুরে একদল গ্রামবাসী জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ায় মমতা গাড়ি থেকে নেমে তাদের পিছু ধাওয়া করেন। গ্রামবাসীরা মমতাকে মারমুখী হয়ে গাড়ি থেকে নামতে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল। মমতা সেটা লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, 'কী রে পালাচ্ছিস কেন! আয় আয়। গালাগালি শিখেছে সব।' তখন অনেকেই ভেবেছিলেন বিজেপির চ্যালেঞ্জের সামনে দিশেহারা মমতা চাপে পড়ে এমন কাণ্ড বাধিয়েছেন। ভোট মিটতে দেখা গেল বিজেপি আঠারোটা আসনে জয়ী হয়েছে। মমতা বাইশটা আসন পেলেও নৈতিক পরাজয় ঘটেছে তাঁর এবং তাঁর দলের। এই অবস্থায় তাঁর ওপর চাপ যে আরও বেড়েছে সন্দেহ নেই। এবং পাহাড়প্রমাণ চাপ সামলাতে না পেরে মমতা আরেক কাণ্ড বাধিয়েছেন। এবারও সমস্যা জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে। মমতা যাচ্ছিলেন নৈহাটিতে আয়োজিত বিজেপির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায়। ভাটপাড়ার কাছে একদল বিজেপি সমর্থক তাকে দেখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেয়। মমতা তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে তাদের হুমকি দেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'সব ডাকাত ক্রিমিনাল। সব ক'টাকে তাড়িয়ে ছাড়ব। মেরে চামড়া গুটিয়ে দেব।' এরপর তিনি রকের ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। অভিযোগটি যে সারবত্তাহীন নয় তার প্রমাণ প্রতিটি নিউজ চ্যানেল মমতার বক্তব্যে গালিগালাজের অংশটি সম্পাদনা করে শোনাতে বাধ্য হয়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। নয়তো মমতার বক্তব্যের পরের অংশের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করা যাবে না। যারা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়েছিলেন তারা সকলেই অবাঙ্গালি। পরে নৈহাটির প্রতিবাদ সভায় মমতা বলেন, 'আমাদের খাচ্ছ আমাদের পরছ আমাদের জন্য বেঁচে আছো তোমরা। আমরা যদি না দেখি তাহলে না খেতে পেয়ে মরবে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথা থেকে মনে হতে পারে হঠাৎ কেন এমন বাড়াবাড়ি শুরু করলেন? রাস্তায় কেউ জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিলে কেন একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গাড়ি থেকে নেমে বচসায় জড়িয়ে পড়তে হবে? উত্তরপ্রদেশে প্রিয়াঙ্কা বঢরার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রিয়াঙ্কা গাড়ি থেকে নেমে জয়শ্রীরাম বলা প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করেন। সৌজন্যের রাজনীতি একেই বলে। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্য তো দূর, জয় শ্রীরাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছেন, তেড়ে যাচ্ছেন, ছাপার অযোগ্য গালাগাল দিচ্ছেন। এমনকী বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি বিভাজন ঘটাতেও কসুর করছেন না। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণে সচেষ্ট। তার ফল এবারের লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ভোট গেছে তৃণমূলের পকেটে। কিন্তু মমতা জানেন শুধু মুসলমান ভোট দিয়ে হবে না। রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিজেপির সমর্থক মূলত হিন্দুরাই। তাই হিন্দুদের ভাগ করতে হবে। বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি বিভাজন সেই হিসেব মেনেই। দেবতা রাম পশ্চিমবঙ্গে ততটা জনপ্রিয় নন। তিনি প্রধানত উত্তর ভারতের দেবতা। তাই মমতা রাম এবং রামভক্তদের আক্রমণ করছেন। সেই সঙ্গে উসকে দিচ্ছেন বাঙ্গালির অহংবোধ। যেন এ রাজ্যে অবাঙ্গালিদের জীবন বাঙ্গালির দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য একটাই। বিজেপিকে অবাঙ্গালিদের দল হিসেবে চিহ্নিত করে তৃণমূলের বাঙ্গালি ভোটব্যাঙ্ক যতটা সম্ভব সুরক্ষিত রাখা।

আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে চালটি ধূর্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু নেত্রীর মানসিক ভারসাম্য হারানোর লক্ষণ থেকে মুক্ত নয়। বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গে দেবতা হিসেবে রাম গুরুত্ব হারালেও এক সময় যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তার প্রমাণ শ্রীম রচিত কথামৃত। যেখানে কোটি কোটি বাঙ্গালির আরাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বহুবার ভগবান ও ভক্তের সম্পর্ক বোঝাতে রাম ও হনুমানের উদাহরণ দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বাঙ্গালিদের কী জবাব দেবেন মমতা? মমতার হিস্টিরিয়ার আর একটি লক্ষণ, তার দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতি বছর ঘটা করে হনুমান জয়ন্তী পালন করে। এবং সেটা করে অবাঙ্গালিদের কাছে টানবার জন্যেই। অথচ যে মুহূর্তে অবাঙ্গালিরা বিজেপিকে ভোট দিল মমতা পালটে গেলেন। অপমান করলেন তাদের। আসলে মমতা ভয় পেয়েছেন। ক্ষমতাচ্যুত হবার ভয় তো আছেই। সেই সঙ্গে রয়েছে ক্ষমতাচ্যুত হবার পরের ভয়। মমতা ক্ষমতায় না থাকলেও দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী থাকবেন। অমিত শাহ থাকবেন। ইতিহাস বলছে স্বৈরাচারী শাসকেরা এভাবেই একসময় মানসিক ভারসাম্য হারান। তখন বোঝা যায় তাদের শেষ লগ্ন উপস্থিত। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনও আসন্ন।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, ৩৭০ ধারা বিলোপ আর রামমন্দির করতেই হবে বিজেপিকে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বিপুল জনসমর্থনকে পাথেয় করে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরেছেন। নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনটি এক কথায় ঐতিহাসিক এবং চমকপ্রদ। ঐতিহাসিক এবং চমকপ্রদ এই কারণেই যে, প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীকে বাদ দিলে নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রথমবারের থেকেও বিপুল জনাদেশ নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরলেন। এবং তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি এবারের লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। এবার নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই বিরোধী দলগুলি এবং সংবাদমাধ্যম শোরগোল ফেলে দিয়েছিল যে, এই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিদায় আসন্ন। বিরোধী দলগুলি সরকার গড়ার ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, ফল ঘোষণার পরদিন দিল্লিতে বৈঠকে বসবে বলেও তারা স্থির করে রেখেছিল। সেই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিরোধীদের নিম্নস্তরের ব্যক্তি আক্রমণ তো ছিলই। বিরোধীরা যাই বলুন এবং যাই করুন না কেন, সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন নরেন্দ্র মোদীর আচারণ ছিল একজন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মতোই। প্রথমাবধি তাঁকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী লেগেছে। এবং নির্বাচনী প্রচারের প্রথম লগ্ন থেকেই নরেন্দ্র মোদী বলে এসেছেন ২০১৪-র থেকেও এবার মোদী হাওয়া আরও জোরদার। নরেন্দ্র মোদীর বোঝায় যে কোনো ভুল ছিল না, বরং তিনি যে দেশের মানুষের আবেগটিকে ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছিলেন, নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পর তা আরো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

বিপুল জনাদেশ সম্বল করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বারের জন্য এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই, এই সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া। এই প্রত্যাশার অনেকখানিই আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিজেপি, বিশেষত প্রধানমন্ত্রীকে পূরণ করার চেষ্টা করতেই হবে। যেমন, বেকারত্ব দূর করা, নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। কৃষিক্ষেত্রকে লাভজনক করে তোলা। সামাজিক সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। বনবাসী জনজাতিদের অধিকার সুরক্ষিত করা। পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলির উন্নয়ন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি আবার একথাও সত্য একশো শতাংশ প্রত্যাশা পূরণ কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না একারণেই যে—মানুষের প্রত্যাশার কোনো অন্ত নেই। তবু, ক্ষমতায় এসে যতদূর সম্ভব পূরণ করার প্রচেষ্টাটি অন্তত করতেই হবে। এটুকু করলেই মানুষ বুঝতে পারবে, যে সরকারটিকে তারা নির্বাচিত করল, সেই সরকার তাদের চাহিদাগুলিকে মর্যাদা দিচ্ছে। কাজটি সহজ নয়, অতীব কঠিন। কিন্তু এই কঠিন কাজটিই আগামী পাঁচবছরে বিজেপিকে করতে হবে। আগামী দিনগুলিতে এটিই তাঁর পরীক্ষা।

প্রত্যেক নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের যে নির্বাচনী ইস্তাহারটি প্রকাশ করে, তাতেও নানারকম প্রতিশ্রুতি এবং লক্ষ্যের কথা বলা হয়, যে প্রতিশ্রুতি এবং লক্ষ্যগুলি পূরণে নির্বাচনের পর দায়বদ্ধ থাকে রাজনৈতিক দলগুলি। এই প্রতিশ্রুতি এবং লক্ষ্যগুলি সাধারণত দু' ধরনের। একটি নির্বাচকমণ্ডলীর মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করা, তাদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান এবং সামাজিক পরিষেবার সুষ্ঠু বণ্টন। অন্যটি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশ এবং দেশের নাগরিকের স্বার্থে করণীয় কিছু কর্তব্য। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তার যে নির্বাচনী ইস্তাহারটি প্রকাশ করেছে, তাতেও এই দুটি ক্ষেত্রে নানারকম প্রতিশ্রুতি এবং লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ থেকে শুরু করে দলের নানাস্তরের নেতারাও নির্বাচনী প্রচারে এসে এই প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়ে গিয়েছেন। এবার সেটা তাদের পূরণ করার পালা।

সামাজিক ক্ষেত্রে বিজেপির করণীয় কর্তব্য কী—সে প্রসঙ্গে এখানে আলোচনায় ঢুকছি না। বরং, জাতীয় ক্ষেত্রে দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আলোকপাত করা যাক—যা আগামী পাঁচবছরে বিজেপির কাছে অবশ্য করণীয় হয়ে ওঠা উচিত। এবং দেশের মানুষও মনে করছে যে এই

কাজগুলি বিজেপিই করতে পারবে, বিজেপিরই করা উচিত। আগামী পাঁচবছর বিজেপির এই অবশ্য করণীয় কর্তব্যগুলির মধ্যে এক নম্বরে থাকা উচিত কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ। আজ যাঁরা বিজেপির কর্ণধার তাঁদের মনে রাখতে হবে, এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'এক নিশান এক বিধানে'-র ডাক দিয়ে কাশ্মীর অভিযান করেছিলেন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্যই কাশ্মীরের জেলখানায় প্রাণ দিয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকেই শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন ৩৭০ ধারা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপকেই উৎসাহ জোগাবে। ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবি বিজেপি নেতৃত্ব অনেক দিন ধরেই জানিয়ে আসছে। জম্মু এবং লাদাখের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরও দাবি এই ধারা অবিলম্বে বিলুপ্ত করা হোক। এছাড়াও, দেশের অন্যান্য অংশের নাগরিকরাও মনে করছেন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা জারি রাখা এখন অনর্থক। শুধু কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স, কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এবং কংগ্রেস-বামপন্থীদের মতো কিছু তথাকথিত সেকুলার বিরোধী দল এই ৩৭০ ধারা বিলোপের পক্ষে নয়। বিজেপিকে মনে রাখতে হবে, তাদের যারা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে, সেই জনগণ কিন্তু কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই দেখতে চায়। তারা কিন্তু কাশ্মীরের জন্য আলাদা কোনো সংগঠন বা আলাদা কোনো নিদান চান না। এছাড়াও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা থেকে মুক্ত করতেও যে ৩৭০ ধারা বিলোপ আশু কর্তব্য সেটাও নতুন সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে।

দ্বিতীয়, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যও বিজেপির পালন করা উচিত। তা হল, সমগ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবিটিও বিজেপির নিজস্ব দাবি। একথাও সত্য, এতদিন তা কার্যকর করার মতো অবস্থায় বিজেপি ছিল না। কিন্তু এবার এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর, অনেকদিনের না করতে পারা কাজগুলিকে এবার করে ফেলবার একটি সুযোগ বিজেপির সামনে এসেছে। যে ঘৃণ্য এবং নগ্ন তোষণের রাজনীতি স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশে চলে আসছে, তাকে বন্ধ করতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলন আশু কর্তব্য। এটা বিজেপি নেতারা বোঝেন। বোঝেন বলেই আশা করা যায়, ২০১৯-এ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে এসে এই বিষয়ে নরেন্দ্র মোদি পদক্ষেপ করবেন।

এরই পাশাপাশি আর একটি কাজও গুরুত্ব সহকারে করতে হবে নতুন সরকারকে। কাজটি হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। মনে রাখতে হবে, অনিয়ন্ত্রিত জনবৃদ্ধি যে কোনো দেশের উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। দ্বিতীয়ত, এই অনিয়ন্ত্রিত জনবৃদ্ধির ফলে দেশের সামাজিক ভারসাম্যও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের বদলে ইসলামিক ভারত রাষ্ট্র দেখতে হবে—এরকম আশঙ্কা থেকেই যায়। কাজেই ভারতের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রেখেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করতে হবে। দুটির বেশি সন্তান হলে কঠোর সাজা—এই রকম আইন চালুও করতে হবে।

জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণও একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। অসমের মতোই পশ্চিমবঙ্গও অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভারে ভারাক্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলাতেই এই অনুপ্রবেশকারীদের দৌলতে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। আর এর ফলে এই রাজ্যে মৌলবাদী জেহাদি কার্যকলাপের প্রকোপ বেড়েছে, অনেক অঞ্চলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কাজেই অসমের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে অবিলম্বে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ শুরু করা প্রয়োজন। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ তাঁর নির্বাচনী প্রচার পর্বে এই রাজ্যে এসে বলেও গিয়েছিলেন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করা হবে। এই প্রতিশ্রুতিটি পালন করার সময় এখন এসে গিয়েছে।

সর্বশেষ কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ—অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ। এই প্রতিশ্রুতিটি এবার বিজেপিকে পালন করতেই হবে। এবং এই বিষয়ে বিজেপিকে স্পষ্টবাদিতার পথ বেছে নিতে হবে। রামমন্দির নির্মাণে যদি আর কোনোভাবে কালক্ষেপ হয়—তাহলে নির্বাচকমণ্ডলীর বিরাট অংশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। রামমন্দির দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণের আবেগের কেন্দ্র। সে আবেগকে যেন বিজেপি আঘাত না করে।

আগামী পাঁচ বছর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজ করার সময়। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার আত্মপ্রসাদে বিজেপিকে তুষ্ট হলে চলবে না। আত্মতুষ্টি যে অনেক সময় ক্ষতির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। বরং আগামী পাঁচ বছরে নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করে বিজেপি চেষ্টা করুক—আগামী কয়েক দশক সরকারে টিকে থাকার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করতে। ■

প্রত্যাশী ভারত : ভরসা মোদীজীর আত্মশক্তি

সুজিত রায়

তিনি এলেন। দেখলেন। এবং জয় করলেন।

ব্যাপারটা ঠিক সেভাবে ঘটেনি।

না ২০১৪-য়। না ২০১৯-এ।

২০১৪-য় দেশবাসীর সামনে তিনি এসেছিলেন একজন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে। কিংবা বলা ভালো স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হিসেবে। ২০১৯-এ তাঁর দ্বিতীয়বার আগমন স্বপ্নস্রষ্টা হিসেবে। এবার শুধু স্বপ্ন দেখানো নয়। স্বপ্ন পূরণের দুরূহ দায়িত্ব কাঁধে দেশমাতৃকার চরণতলে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। সেই গুজরাটের ভাবনগর স্টেশনে চায়ের কেটলি আর ভাঁড় হাতে শীতার্ত ভোরে দৌড়ে বেড়ানো এনডি। সতেরো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে গোটা দেশ ঘুরে ভারতবর্ষের আত্মার সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো নরেন্দর। তারপর জীবনের নানা গোলকধাঁধা অতিক্রম করে, চার-চার বার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রিত্ব করে অবশেষে দিল্লির দরবারে। ২০১৪-র পর এবার আবার। প্রথমবার একাই বিজেপি ২৮৩। তাঁরই নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার একাই বিজেপি ৩০৩। সেই মোদীর নেতৃত্বেই। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাঁটা পার হয়ে এগিয়ে অনেকটাই মোদীজী। আজকের ভারতবর্ষের অপ্রতিরোধ্য শাহেনশা। এক এবং অদ্বিতীয়। প্রতিযোগী কাউকে খুঁজে পেতে হলে দূরবীন দরকার। কিন্তু না, আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত নন তিনি। তিনি জানেন স্বপ্নস্রষ্টা মোদীর কাছে এবার প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। প্রতিটি ভারতবাসীর প্রত্যাশা। দেশে, এমনকী বিদেশেও। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে অনাবাসী ভারতীয়দের প্রত্যাশাও।

কেমন সে সব প্রত্যাশা?

প্রথম প্রত্যাশা ঃ এক জাতি এক প্রাণ। বহু যুগ পর, বহু দুঃস্বপ্নের বছর কাটিয়ে ভারতবাসী আজ নিজেকে চিনেছে। আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে। এবারের নির্বাচন এবং নির্বাচনী ফলাফল দেশের মানুষকে বলতে সাহস যুগিয়েছে। 'সগর্বে বল, আমি ভারতবাসী' বলতে উদ্দীপনা যুগিয়েছে—'সগর্বে বল, আমি হিন্দু, হিন্দুত্ব আমার আদর্শ।' একটা মানুষ ৭০ বছর বয়সে এক মাসেরও কম সময়ে ১,০৫,০০০ কিলোমিটার পরিভ্রমণ করে ১৪২টা নির্বাচনী সমাবেশে মানুষের কাছে ভোট চেয়েছেন যতটা তার চেয়ে বেশি জুগিয়েছেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা। এবার মানুষ চাইছে—আর স্লোগান নয়। গোটা দেশের জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে নিয়ে মোদীজী 'এক জাতি এক প্রাণ' নীতির প্রতিষ্ঠা করুন। নিপাত যাক সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদ। নিপাত যাক আঞ্চলিক রাজনীতি। মানুষ রায় দিয়েছে মোদীর নেতৃত্বে স্থায়ী হোক বিজেপি সরকার। মোদীজীর কথায় যে সরকারের ছাতি চওড়া করার দরকার হবে না। কিন্তু মাথা ছোঁবে আকাশ 'এক জাতি এক প্রাণ' ভারতবর্ষ।

দ্বিতীয় প্রত্যাশা ঃ এক জাতি এক আইন

রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ নয়। কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নয়। মানুষে মানুষে বিভেদ নয়। আইনের অনুশাসন হোক এক এবং তা সবার জন্য। কাশ্মীর হোক ভারতবর্ষের মূল স্রোতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীরবাসী হোক এক জাতি এক দেশ ভারতবর্ষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশীদার। তাই বিলুপ্ত হোক সংবিধানের ৩৭০ ধারা। বিলুপ্ত হোক সংবিধানের ৩৫-এ ধারা। বিলুপ্ত হোক তিন তালাক প্রথা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংখ্যালঘু মা-বোনেদের বোরখার আড়ালে চোখের জলে ভাসতে বাধ্য করেছে। সংস্কার হোক

শরিয়ত আইনের সংখ্যালঘু জনজীবনের সুস্থতার স্বার্থেই। নিয়ন্ত্রিত হোক জনসংখ্যার প্রাবল্য। আর কতকাল একই ভারতবাসী শিকার হবে আইনের দ্বৈত সত্তার।

তৃতীয় প্রত্যাশা । এক দেশ এক দল

দুঃস্বপ্নই বটে! একশো তিরিশ কোটি মানুষের দেশে ২৪২৬টি রাজনৈতিক দল। কেবল ৭টি সর্বভারতীয়। ৩০৯টি আঞ্চলিক দল স্বীকৃত, বাকি ২০৪৪টি অস্বীকৃত এবং আঞ্চলিকতাবাদে পুষ্ট। ২০১৪য় ইঙ্গিত মিলেছিল কিছুটা। ২০১৯-এ সব ধুয়ে মুছে সাফ। এরা এতকাল রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রবিরোধী ইস্যু তৈরি করে লেজ নেড়েছে আর ভারতবর্ষের রাজনীতির গভীরে খুঁড়েছে দুর্নীতির সুড়ঙ্গ---অনেকটা ধানক্ষেতে ইঁদুরের গর্তের মতো। এবার বিজেপি একাই শের। উত্তরপ্রদেশে সপা, বসপার গর্জন শেষ। পশ্চিমবঙ্গে, অসমে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় শেষ তৃণমূল কংগ্রেস আর ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলো। মানুষের প্রত্যাশা---হাজার দলের দলাদলি শেষ হোক। ক্ষমতায় থাকুক একদল। যে দল মানুষকে সম্মান দেবে। সংবিধানকে সম্মান দেবে। গণতন্ত্রকে সম্মান দেবে।

চতুর্থ প্রত্যাশা ঃ এক জাতি এক অধিকার

মুখে বলা হবে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সবার। নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সবার জন্য। সবার অধিকার হাতে হাতে ডিগ্রি, হাতে হাতে কাজ। সব পেটে ভাত। কিন্তু সংরক্ষণের গেরোয় ঝুলতে থাকবে মেধাবী লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ তরুণী শিক্ষাক্ষেত্রে, সরকারি চাকুরিক্ষেত্রে, সামাজিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে। মানুষ চাইছে মোদীজীর কাছে অধিকার সমান হোক সব ভারতবাসীর। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে যেমন কোনও তরুণ তরুণী অন্যায় করেননি, তেমনি ডোমের সন্তান হয়ে কোনো তরুণ তরুণী মহাপুণ্য করেননি। একই রোদের আলোয়, একই গাছের ছায়ায় বেড়ে ওঠা দুই সন্তান কেন ভোগ করবে পৃথক ফল? অতএব বিলুপ্ত হোক সংরক্ষণ প্রথা।

পঞ্চম প্রত্যাশা ঃ এক জাতি এক নেতা

ইতিহাসে নজিরের অভাব নেই সেই সব নেতার যাঁরা একটি জাতিকে গড়ে তুলেছেন তিলে তিলে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল একজন সঠিক নেতার যিনি গোটা দেশ এবং জাতির চালিকাশক্তি হয়ে পথ দেখাবেন মানব-উন্নয়নের। মানুষ খুঁজছিল এক নেতাকে যিনি শিব গড়তে গিয়ে শিবই গড়বেন, বাঁদর নয়। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে মুখ ঢেকে নয়, ভারতীয়ত্বকে আত্মার আত্মীয় করে গড়ে তুলবেন প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ। এবার বুঝি সত্যিই মিলল সেই নেতা যাকে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ সব বিশ্বাস উজাড় করে ঢেলে দিল একটাই প্রত্যাশা নিয়ে একটা ভালো দেশের মানুষ হতে চায় ভারতবাসী।

প্রত্যাশার শেষ নেই। দাবির অন্ত নেই। অভাবী রাষ্ট্রের সমস্যা তো এটাই যে কিছুতেই অভাব মেটে না। তবু প্রত্যাশা হয়তো এবার মিটবে। কারণ মোদীজী কথা দিয়েছেন সংকল্পপত্রে ঠিক ভোটের আগেই ‘সংকল্প ভারত সশক্ত ভারত।’ ২০২২-এ ভারতবর্ষের পরাধীনতা মুক্তির ৭৫ বছরে গাঁথা হয়ে যাবে উন্নয়নের ৭৫টি মাইলস্টোন। সময় সারণী নির্দিষ্ট। ২০৩০ এর মধ্যে ভারতবর্ষ হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। ‘সময়ের কাজ সময়ে’ ফর্মুলা ধরেই এগোবে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নাগরিক কল্যাণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, মানব উন্নয়নের কাজ। সব পরিবারে পাকা বাড়ি, সব ঘরে রান্নার গ্যাস, সব ঘরে বিদ্যুৎ, টয়লেট, পানীয় জল, সবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। জাতীয় সড়ক বাড়বে দ্বিগুণ, এয়ারপোর্টের সংখ্যা হবে ১৫০। বন্দরের ক্ষমতা বাড়বে ২৫০০ মেট্রিক টন। সব রেলপথে বিদ্যুতায়ন। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর। মহিলাদের হাতে কাজ, যুবশক্তির উন্মেষ। খামতি নেই কিছুরই এবং প্রতিশ্রুতি সময়-সরণী মেপে চলার। সরকার কাজ করবে দিনে ১৮ ঘণ্টা। মানুষ প্রত্যাশী, মোদীজী আত্মশক্তিতে বলীয়ান। মানুষ বিশ্বাস করেছে তাঁকে আবার। স্বপ্নদ্রষ্টা না হয়ে উপায় কী! ■

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিষয় এখনই জরুরি

মোহিত রায়

লেখাটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর প্রতি। তাঁর পক্ষে এই লেখা পড়া সম্ভব হবে না, কিন্তু এমন অনেকেই পড়বেন যাঁরা নরন্দ্রে দামোদাসদাস মোদীকে বা তাঁর ঘনিষ্ঠজনকে এই লেখার বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন। লেখাটি আসলে তাঁদের জন্য, তাঁদের কাছেই আমার অনুরোধ।

তিনটি বিষয়ে যাবার আগে আজকের সময়ের প্রেক্ষাপট একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। এখন ২০১৯-এর জুন মাস। ঠিক এর আগের মাসে ২৩ মে ভারতের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার জোট বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু এটুকু বললে কিছুই বোঝা যাবে না। কারণ এবারের মুখ্য স্লোগান যা টিভি, বেতার, সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদপত্র সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে তা ছিল— 'ফির একবার, মোদী সরকার'। অর্থাৎ এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন একদিকে নরেন্দ্র মোদী ও অন্য দিকে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দল। নির্বাচনে ঘোষণা হয়েছিল ১০ মার্চ। নির্বাচন শুরু হয় ১১ এপ্রিল এবং সাত দফায় শেষ হয় ১৯ মে। নরেন্দ্র মোদী নির্বাচন প্রচার শুরু করেন ২৮ মার্চ। শেষ করেন ১৭ মে এবং এই ৫১ দিনে ২৫টি প্রদেশে ১৪৪টি সভায় ভাষণ দেন। নরেন্দ্র মোদীর কাছে পশ্চিমবঙ্গ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গে ১৭টি সভায় ভাষণ দেন যা উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্যান্য সব রাজ্যের চেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষও নরেন্দ্র মোদীকে উপযুক্ত সম্মান জানিয়েছেন। বিগত লোকসভায় মাত্র ২টি আসন থেকে ১৮টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করেছে। সুতরাং এই দেওয়া-নেওয়ার শুভ চর্চায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অনেক আশা নরেন্দ্র মোদীর কাছে। সেরকম তিনটি আশার কথাই একবার বলা যাক।

আশার কথা বলার আগে আরও একটু কথা বলা দরকার। সেটা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্য সব প্রদেশের থেকে একটি বিষয়ে একেবারে আলাদা। অন্যান্য প্রদেশের সরকার পরিবর্তনে সেই প্রদেশের ভালো বা মন্দ হতে পারে, রাজ্যের মানুষ তা দেখে পরে আবার নতুন সরকার নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম নয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কয়েকটি ভুল পদক্ষেপ রাজ্যকে ভারতের বাইরে ঠেলে দিতে পারে, যদি ভারতেও থাকে সেই পশ্চিমবঙ্গ কার্যত হবে পশ্চিম বাংলাদেশ। এই প্রসঙ্গে মনে করানো যেতে পারে যে, আজকের ভারতের দুটি প্রদেশ স্বাধীনতার সময়েই ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাজিত হয়— পঞ্জাব ও বাংলা। স্বাধীনতার সময়ই ধর্মীয় জনবিনিময়ের ফলে ভারতীয় পঞ্জাবে মুসলমান-জনসংখ্যা অতি সামান্য। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই বিপরীত। ধর্মীয় জনবিনিময় তো হয়ইনি, বরং জওহরলাল নেহরুর ঘৃণ্য চক্রান্তে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছে এবং বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর বামফ্রন্ট সরকারের আনুকূল্যে ও পরে তৃণমূল সরকারের মদতে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। অবস্থাটা এখন এমন যে, পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় অস্তিত্ব, ভূখণ্ড ও সংস্কৃতি— দুটিই বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে সময়ের সুতোয়। সুতরাং নরেন্দ্র মোদীকে যা করতে হবে তা এখনই করতে হবে, নইলে পরে আর কিছুই করা যাবে না।

প্রথম বিষয়টি হলো নাগরিকত্ব বিল। নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে ধন্যবাদ যে ২০১৫-র ৭ সেপ্টেম্বর পাসপোর্ট আইন ও ফরেনার্স আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ধর্মীয় অত্যাচারের ফলে চলে আসা সব হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিখ জৈন ও পারসি জনসাধারণকে ভারতে আইনি বসবাসের অনুমতি প্রদান করেছে। এরপর ১৯ জুলাই ২০১৬-তে লোকসভায় পেশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৬। এতে বলা হয় যে যাঁদের পাসপোর্ট আইন ও ফরেনার্স আইন সংশোধন করে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁরা বেআইনি অভিবাসী নন এবং তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য হলেন। লোকসভায় আলোচনার পর বিলটি

যৌথ সংসদীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়, সেখানে বছর দেড়েক এই কমিটির সামনে বিভিন্ন সংগঠন তাদের বক্তব্য রাখে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক সংগঠন এই কমিটির সামনে বক্তব্য রাখলেও, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই লেখকের নেতৃত্বে মাত্র একটি দলই বক্তব্য রেখেছিল। এই কমিটি সামান্য সংশোধন করে ও বিলটি ৮ জানুয়ারি ২০১৯-এ লোকসভায় পাশ হয়। কিন্তু যেহেতু বিজেপি ও সহযোগীদের রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না সেটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়নি। এরপর লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ও বিলটিরও মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলা হয়নি তা হলো, এই বিলটির সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পশ্চিবঙ্গের কাছে। কারণ বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ৮০ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু এই বিলটি তৈরির সময় কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির (বিজেপির উদ্বাস্তু সংগঠন সহ) সঙ্গে আলোচনা করেনি। বর্তমান নাগরিকত্ব বিলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা এই যে, এই বিলে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের আবেদনপত্রে তাঁদের উপর বাংলাদেশে ধর্মীয় অত্যাচারের কোনো বিবৃতি চাওয়া হয়নি। এটি এজন্য ভীষণ প্রয়োজনীয় যে এর ফলে আমরা ১ কোটি মানুষের তাঁদের উপর ইসলামি অত্যাচারের আইনি বিবৃতি পাব যা আগামীদিনের ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে। এই ১ কোটি দলিল আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে পেশ করতে পারব। এই বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর কোনো জবাব দেয়নি। এখন নতুন সরকারের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে প্রথম দায়িত্ব হলো নাগরিকত্ব বিলটি সংশোধন করে আবার লোকসভায় পেশ করা। ২০২০ সালে রাজ্যসভায় বিজেপি ও সহযোগীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এসে যাবে। এই নিবন্ধের পাঠকদের কাছে অনুরোধ আবার বিলটি পেশের আগে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হোক।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো— এন আর সি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবীকরণ। এটি নাগরিকত্ব বিলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাওয়ার পরই অর্থাৎ ২০২০-র শেষ দিকেই এই কাজটি শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রেও আমাদের দাবি যে, এজন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা করুক। কারণ নাগরিকত্ব বিল আইন হয়ে যাওয়ায় অসমের মতো এনআরসি-র আর প্রয়োজনীয়তা নেই। অর্থাৎ অসমের মতন পশ্চিমবঙ্গের সব নাগরিককে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের এনআরসি-র প্রয়োজন হলো বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা ও পরে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। সেজন্য একমাত্র পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলমানদের কাছেই তাঁদের এখানে বসবাসের প্রমাণপত্র চাওয়া উচিত। যেহেতু আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা, সেহেতু অন্য ধর্মের মানুষদের কাছে কোনো প্রমাণপত্র চাওয়া অহেতুক এবং এতে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। এর ফলে কেবলমাত্র ৩০ শতাংশ মানুষকেই প্রমাণপত্র দিতে হবে, এতে যেমন অর্থ বাঁচবে, বাঁচবে সময়। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুজনেই লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রতিটি ভাষণে এনআর সি-র কথা সোচ্চারে বলেছেন, সুতরাং তাঁদের কাছে আবেদন বিষয়টি তাঁরা বিবেচনা করুন।

তৃতীয় বিষয়টি হলো— তিস্তার নদী জলের চুক্তি। তিস্তা জল নিয়ে চুক্তিটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সরকারের তৈরি। সেই চুক্তি নিয়েই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাজির হন ঢাকায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরোধিতা করেন এবং চুক্তিটি এখনো স্বাক্ষরের অপেক্ষায়। এই চুক্তির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস ও বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গের কোনো মতামতের অপেক্ষা করেনি। ইসলামি মৌলবাদের পালে হাওয়া দেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে যেমন জনপ্রিয় আবার তিস্তা চুক্তিতে বাধা দেওয়ায় অনেকটাই অপ্রিয়। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত তিস্তার বর্তমান জলসম্পদের উপর সমীক্ষা করে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য বিশেষজ্ঞ ও তিস্তার জলের ব্যবহারকারীদের নিয়ে আলোচনা করে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া। না হলে বর্তমান তিস্তা চুক্তি পশ্চিমবঙ্গ ও বিজেপির জন্য অভিশাপ বয়ে আনতে পারে।

এই তিনটি বিষয়ের একটি সাধারণ কথা— পশ্চিমবঙ্গের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত নেবার আগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করুন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেননি জওহরলাল নেহরু। আজকের পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশ সমস্যার শুরু সেই নেহরু-লিয়াকত চুক্তি থেকেই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা করেই সব সিদ্ধান্ত নেবে। ■

মোদীজীর কাছে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান চাই

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে জনপ্রিয়তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পণ্ডিত নেহরুর জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রাম, পারিবারিক আভিজাত্য, আদ্যন্ত বিলেতি শিক্ষার প্রভাব এবং সর্বোপরি গান্ধীজীর কৃপাকে চিহ্নিত করা যায়। শ্রীমতী ইন্দিরার নেহরু-গান্ধী লিগ্যাসি, বাংলাদেশ যুদ্ধ বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'সুন্দর মুখের কদর'কে উল্লেখ করা যেতে পারে। মোদীর মধ্যে এমন একটিও উপাদান লক্ষ্য করা যায় না। বরং কঠোর স্বয়ংসেবকের কৃচ্ছসাধন ও একের পর এক অগ্নি পরীক্ষায় উত্তোরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁর এই নজিরহীন জনপ্রিয়তা যা বহু রাজনীতিজীবীর কাছেই ঈর্ষণীয়।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শপথ নেওয়ার পরের দিনেই গোধরার মতো ঘটনা। তার পর থেকে তাঁর গুজরাট নির্মাণ ও ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডের কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম পাঁচ বছরে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা যায় একটা দুর্নীতিমুক্ত গোটা মন্ত্রীসভা উপহার দেওয়া।এছাড়া যতো সমালোচনাই হোক না কেন নোটবন্দি থেকে জিএসটি লাগু করা, সড়ক সম্প্রসারণ থেকে চার শতাংশে মুদ্রাস্ফীতিকে লাগাম পরানোর মতো সাহস তিনি দেখিয়েছেন। মিলটন ফ্রীডম্যান বর্ণিত 'টাইর‍্যানি ও স্ট্যাটাসকো' থেকে অর্থনীতিকে বের করে এনে বেপরোয়া হওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। নিজেকে দরিদ্র ভাবা যে দুর্বলতার প্রকাশ সেই শক্তিদায়ক ভাবনায় জনগণ আজ উজ্জীবিত। ভারত আজ বিশ্বে কেবল চতুর্থ বহত্তম জিডিপি-র দেশই নয় সপ্তম বৃহত্তম বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারও।

সফল মানুষের কাছে প্রত্যাশা বাড়ে। তাই তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম একশো দিনে আমি দুটি ছক্কা চাইব। প্রথমটি হলো আমাদের যেন আর বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মহুল চোকসির মতো জাল ছেঁড়া রাঘব বোয়ালদের দেখতে না হয়। বোফর্সের কাত্রোচ্চি, ভূপাল গ্যাস ট্র্যাজেডির অ্যান্ডারসন বা পুরুলিয়া অস্ত্রবর্ষণে পিটার ব্লিচদের নিরাপদ মার্গদর্শনে কংগ্রেস সরকার যে ভূমিকা নিয়েছিল তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। প্রয়াত অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট অধিনায়ক রিচি বেনো বলতেন, 'দলে একজন দক্ষ ফিল্ডার থাকা খুব জরুরি। সে নিজে দশ রান করলেও পঞ্চাশটা রান বাঁচাতে পারে।' জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের বেআইনি বহির্গমন নতুন সরকারের তাই অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় যে প্রত্যাশা আমার মতো প্রতিটি ভারতবাসী মনে মধ্যে পোষণ করছে তা হলো কাশ্মীর, বিশেষ করে উপত্যকার ভূমিপুত্রদের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া। এই কঠিন কাজটা প্রধানমন্ত্রীকে করতেই হবে। কাশ্মীর ভারতীয় ঐতিহ্য পরম্পরা, ইতিহাসের ধারার যে উজ্জ্বলতম প্রতীক সেটাকে জনমনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জওহরলাল নেহরু, 'কাশ্মীর আমার রক্তে কাশ্মীর আমার হৃদয়ে' বললেও এই ভারত ভূস্বর্গের আত্মাকে অনুধাবন করেননি। মাউন্ট ব্যাটেনের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমাত্র থেকে কাশ্মীর প্রসঙ্গকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গেছেন। ভারতীয় সভ্যতার উৎস বলা যায় কৃষ্ণ (কিষেণ) গঙ্গা, অধুনা নীলম নদী তীরের সারদাতীর্থ। বর্তমান পাক সরকার এই হিন্দু সভ্যতার উৎস ভূমিটিকে মহেঞ্জোদরোর মতো রক্ষার কথা ভাবছে। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেরা আজও উত্তর মুখে করজোড়ে উচ্চারণ করে, 'নমস্তে সারদা দেবী কাশ্মীরমণ্ডলবাসিনী' যেখানে অনেকের বিশ্বাস বিদ্যার দেবীর আবাস।

অতীতে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে তথা বিশ্বে আদান-প্রদানে এই কাশ্মীর তীর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব যুগে বুদ্ধভদ্র, কুমারজীবের মতো ভারতীয় পণ্ডিত, মেগাস্থিনিসের মতো গ্রিক পর্যটক কিংবা ফা হিয়েন, হু এন সাঙের মতো চৈনিক মহাস্থবির জাতকদের যাতায়াতে এই সম্রাট অশোক নির্মিত শ্রীনগরী অসামান্য **melting pot**-এর ভূমিকা নিয়েছিল। যীশুখ্রিস্টের জীবনের পরিসমাপ্তিও এখানে ঘটে বলে অনেকের বিশ্বাস। পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীরকে অপাপবিদ্ধা ধর্ষিতা এক সুন্দরী বলেছেন দোপাট্টা যার স্রোতস্বিনী। ভূতপূর্ব তৃণমূল সাংসদ কৃষ্ণা বসু তাঁর সাম্প্রতিক লেখায় ইয়াসিন মালিকের বসবাসের অঞ্চলকে গাজাস্ট্রিপ বলে রোমান্টিসিজম করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীর সংক্রান্ত কোনো নীতিই সমাধান আনেনি। বহুবার প্রমাণিত হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তি আনতে পারবে না। আমাদেরই সেই উদ্যোগ নিতে হবে। এখানকার কোনো ভূমিপুত্র যেন ভবিষ্যতে পুলওয়ামার ঘটনা ঘটাতে না পারে। আসমুদ্র হিমাচলের যে ভারতীয় তরুণ হৃদয় আজ নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী হরণ করেছেন তাতে ভূস্বর্গের তরুণদেরও শামিল করতে হবে।

এই দুরূহ কাজটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সামনে একশো দিনে সমাধান না হোক আমি চাইব নজরকাড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুন যাতে কাশ্মীরি তরুণটির হৃদয়ও মোদী মোদী ধ্বনিতে আলোড়িত হয়।

ভারতীয় কাশ্মীরিদের গর্বিত ভারতীয় বানাতে পারলে পাক-ভারত সমস্যার বারো আনাই সমাধান হবে। ■

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌দর্শন

বিনয়ভূষণ দাশ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিবাজী উৎসব কবিতায় লিখেছেন, ''এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।'' একথা শুধু কবির কল্পনা ছিল না, বাস্তবে শিবাজী মহারাজ তাঁর এই আদর্শকে কাজে রূপায়িত করেছিলেন সেই মধ্যযুগে। ভারতের বেশিরভাগ অংশকে তখন প্রবল প্রতাপান্বিত বিদেশি মোগল রাজশক্তি তাঁর তরবারির জোরে পদানত করেছে। দার-উল-হরব-কে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য গোঁড়া, যুদ্ধবাজ, ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে ইসলামিক আক্রমণ দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার দিকে ধাবিত হয়েছে। এই ধরনের এক পটভূমিকায় শিবাজীর উত্থান হয় দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রে। শাহজী ভোঁসলের দ্বিতীয় পুত্র শিবাজীর জন্ম জুন্নার শহরের কাছে শিবনের গিরিদুর্গে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল। তাঁর পরিবারের দাবি অনুযায়ী, তাঁরা রাজা পুরু এবং উদয়পুরের রাণাদের বংশধর। শিবাজীর পিতামহ মালোজী। উদয়পুর থেকে আগত তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো মালোজীও একজন বেতনভুক সৈনিক ছিলেন। তাঁর পিতা শাহজী ভোঁসলে বিজাপুরে ১৬৩৬ সালে চাকুরি নিয়ে চলে যান। ফলে ওই বাল্যবয়সেই শিবাজী ও তাঁর মাকে পুণা শহরে দাদাজী কোণ্ডদেব নামক এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শিবাজীকে বাল্যবয়স থেকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ হতে হয়েছিল। দাদাজী কোণ্ডদেবের সঠিক অভিভাবকত্ব ও মায়ের উপযুক্ত স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে শিবাজী বড়ো হন। ১৬৪৭ সালের ৭ মার্চ দাদাজী মারা যান। ফলে শিবাজী মাত্রই কুড়ি বছর বয়সে নিজেই নিজের কর্তা হয়ে বসেন। আর এর মধ্যেই তিনি সামরিক ও সাধারণ প্রশাসনে নিজেকে শিক্ষিত করে নিয়েছিলেন। তিনি মাউলি জাতির লোকেদের নিয়ে এক সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এরই মধ্যে বিজাপুরের সুলতান দীর্ঘ অসুস্থতায় পড়ে এবং প্রায় দশ বছর পীড়িত থাকে। শিবাজীর সামনে সুযোগ উপস্থিত হয় এবং তিনি এই সুযোগে তোরনা দুর্গ দখল করেন। তাছাড়া, তিনি সরকারি তহবিল থেকে ২ লক্ষ হুন প্রাপ্ত হন। এই অর্থ দিয়ে তিনি রাজগড়ে এক দুর্গ নির্মাণ করেন। এইভাবে শিবাজী তাঁর অভীপ্সিত পথে এগোতে শুরু করেন। এরপরে ধারাবাহিকভাবে তিনি একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হন। মোগলদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ

শুরু হয় ১৬৫৭ সালে। শিবাজী যুদ্ধে যার সঙ্গে যেমন তাঁর সঙ্গে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নীতি ছিল, 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' অর্থাৎ শঠকে শঠতাপূর্বক বিনাশ করা। মহাভারতের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের নীতি অবলম্বন করে তিনি একে একে বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁকে হত্যা (১৬৫৯), শায়েস্তা খাঁকে রাত্রে হঠাৎ আক্রমণ, দক্ষিণ কোঙ্কণে রাজ্যবিস্তার, সুরাট বন্দর লুণ্ঠন, ১৬৬৪ সালে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ, জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পুরন্দরের সন্ধি, আগ্রায় আওরঙ্গজেবের সাক্ষাৎ ও বন্দি হওয়া, বন্দি অবস্থায় পলায়ন ও স্বদেশে প্রত্যাগমন ইত্যাদি ঘটনা পর পর ঘটে যায়। বন্দিদশা থেকে ফিরে শিবাজী তিন বছর (১৬৬৭- ১৬৬৯) চুপচাপ থাকলেন। কিন্তু, তারপরে, ১৬৭০ সালের জানুয়ারি থেকেই আবার যুদ্ধ শুরু করলেন মোগলদের সঙ্গে। মোগলদের কাছ থেকে একের পর এক দুর্গ দখল করতে থাকেন তিনি। অপ্রস্তুত ও গৃহবিবাদে লিপ্ত মোগলরা আর তাঁর সঙ্গে পেরে উঠল না। চারিদিকে শিবাজীর জয়জয়কার হলো। পর পর সুরাট লুণ্ঠন, ডিনডোরির যুদ্ধ, বেরার ও বাগলানা লুণ্ঠন ও অধিকার, কোলি অধিকার ইত্যাদি সম্পন্ন হলো। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলেরা শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হয় এবং তাঁদের গুরুত্ব কমে যায় ভারতের ইতিহাসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অবস্থায় অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতায়—

''তার পরে শূন্য হলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে দিল্লিরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে

দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে হলো তার সীমা।”

শিবাজীর সাম্রাজ্য স্থাপন ও তাঁর রাজ্যাভিষেক ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌দর্শনের সূচনা করে। তাঁর মধ্যে হিন্দু রাজনীতি ও স্বদেশনীতির সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণগুলোই প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, স্বদেশনিষ্ঠ, দৃঢ়, সৎ, সক্ষম প্রশাসক। তিনি ছিলেন মা ভবানী এবং নিজের মাতৃদেবী জীজা বাঈয়ের প্রতি অনুগত ও একান্ত শ্রদ্ধাশীল। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন নির্মম, কিন্তু মহিলা, শিশু এবং নিজেদের লোকের প্রতি ছিলেন দয়ালু। সমস্ত ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সমস্ত ধর্মগ্রন্থের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তিনি তাঁর গুরু স্বামী রামদাসের প্রতি ছিলেন অসীম শ্রদ্ধাশীল। তিনি গুরু রামদাসের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন। তিনি ছিলেন কর্মযোগের উপর আশ্রিত এক আদর্শ নৃপতি। তাঁর গুরু রামদাস সর্বদা তাঁকে আদর্শ রাজা বলে উল্লেখ করতেন। আর শিবাজীও সর্বদা গুরুর উপদেশ অনুযায়ী রাজকার্য করতেন।

বিভিন্ন রাজ্য দখল এবং দক্ষিণ ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করলেও তিনি নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করেননি। ফলে, অন্যান্য রাজা তাঁকে এক জায়গিরদারের পুত্র হিসেবেই গণ্য করছিল। এর ফলে তাঁর অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হচ্ছিল। তাছাড়া, তাঁদের মধ্যে অতি পুরানো বংশগুলি যেমন মোরে, যাদব, নিম্বলকর ইত্যাদি শাহজীও শিবাজীকে ভুঁইফোড়, অকুলীন বলে অবজ্ঞা করত। তাছাড়া শিবাজীর প্রজারাও অসুবিধায় পড়েছিল। কারণ, যতদিন না তিনি রাজা হিসেবে গণ্য হন, ততদিন তাঁর প্রজারা তাঁদের পূর্বের রাজাদের প্রজা। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী তাঁর শিবাজীর শাসন মানতে বাধ্য ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি নিজেকে এক স্বাধীন হিন্দু নরপতি হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এছাড়া মহারাষ্ট্রের সকল মানুষ দেশে স্বাধীন হিন্দুরাজার— ‘হিন্দবী স্বরাজ’ স্থাপনের জন্য উৎসুক ছিল। তিনি প্রচার করলেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্বকালে যে পদ্ধতিতে পুরাতন সম্রাটদের অভিষেক হতো ঠিক সেইভাবে তিনি নিজেকে হিন্দুভারতের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবেন। সেই অনুযায়ী ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। বিরাট সমারোহের উপযোগী নানা ধরনের জাঁকজমক পূর্ণ সজ্জায় রাজধানী রায়গড় সুসজ্জিত করা হয়। কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যজাতের লোক রাজা হতে পারে না; অথচ, সেযুগে ভোঁসলে বংশ শূদ্র বলে গণ্য হতো। এই অবস্থায় শিবাজীর মুন্সী বালাজী আবজী মারাঠা জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কাশী বিশ্বেশ্বর ভট্ট (ডাকনাম গাগা ভট্ট)-কে রাজি করালেন। গাগা ভট্ট শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণে এবং তাঁর আদিপুরুষরা যে সূর্যবংশীয় চিতোরের মহারাণার বংশ তা লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন এবং অভিষেকক্রিয়ায় নিজে প্রধান পুরোহিত হিসেবে কাজ করতে সম্মত হলেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পণ্ডিতগণ এই রাজ্যাভিষেকে আমন্ত্রিত হলেন। এগারো হাজার ব্রাহ্মণ ও তাঁদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পঞ্চাশ হাজার লোক রায়গড় দুর্গে হাজির হলো অভিষেকের পূর্বে প্রয়োজনীয় সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে শিবাজী প্রথমে নিজের গুরু রামদাস স্বামী এবং মাতা জীজা বাঈকে বন্দনা করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ‘অভিষেকের’ শুভদিন। ইংরাজি ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন। সেদিন খুব ভোরে উঠে শিবাজী প্রথমে মঙ্গলস্নান ও কুলদেব-দেবী-মহাদেব ও মাভবানীর পূজা, কুলগুরু বালম ভট্ট, পুরোহিত বিশ্বেশ্বর ভট্ট এবং অন্যান্য পণ্ডিত ও সাধুদের বন্দনা ও বস্ত্রালঙ্কার দান করলেন। তারপরে অভিষেক স্নান সম্পন্ন অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে সিংহাসন-গৃহে প্রবেশ করলেন। অনুষ্ঠানাদির পরে তিনি সিংহাসনে উপবেশন করলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্লোক পাঠ করে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। প্রথমে গাগা ভট্ট, তারপরে অষ্টপ্রধান ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজাকে আশীর্বাদ করলেন। পণ্ডিত গাগা ভট্ট গঙ্গা-সিন্ধু-যমুনা-গোদাবরী-কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর পবিত্র জল তাঁর মস্তকে সিঞ্চন করলেন এবং অভিষেকমন্ত্র পাঠ করলেন। তাঁর মাথার উপর রাজছত্র ধরা হলো। তাঁকে ‘শককর্তা’, ক্ষত্রিয় কুলবন্তস’ এবং ‘ছত্রপতি’ উপাধিতে ভূষিত করা হলো। এইভাবে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়।

কিন্তু তাঁর মা জীজা বাঈ এর ঠিক পরেই, ১৮ জুন, ১৬৭৪ সালে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই প্রয়াত হন। একে খারাপ লক্ষণ মনে করে আবার ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৬৭৪ দ্বিতীয়বার তাঁর ‘অভিষেক’ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইবার অভিষেক সম্পন্ন হয় তান্ত্রিক মতে এবং এতে পৌরোহিত করেন নিশ্চল পুরী।

শিবাজী মহারাজের এই রাজ্যাভিষেকের তাৎপর্য ভারতীয় এবং হিন্দু সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের মুসলমান শাসনের দীর্ঘ তমসাকাল কাটিয়ে আবার ধুমধাম করে এক হিন্দু রাজার রাজ্যাভিষেক হিন্দুজাতির মধ্যে এক নতুন আশা ও ভরসার সঞ্চার করেছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, ‘‘একতাহীন, নানা খণ্ডরাজ্যে বিছিন্ন, মুসলমান রাজার অধীন, এবং পরের চাকর মারাঠাদের ডাকিয়া আনিয়া শিবাজী প্রথমে নিজ কার্যের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা নিজেই নিজের প্রভু হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। তাহার পর, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে বর্তমানকালের হিন্দুরাও রাষ্ট্রের সব বিভাগের কাজ চালাইতে পারে; শাসন-প্রণালী গড়িয়া তুলিতে, জলে-স্থলে যুদ্ধ করিতে, দেশে সাহিত্য ও শিল্প পুষ্টি করিতে, বাণিজ্যপোত গঠন ও পরিচালন করিতে, ধর্ম রক্ষা করিতে, তাহারা সমর্থ; জাতীয় দেহকে পূর্ণতা দান করিবার শক্তি তাহাদের আছে।

শিবাজীর চরিত্র-কথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয় বটের মতো হিন্দুজাতির প্রাণ মৃত্যুহীন, কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তির ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার নূতন শাখাপল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন করিলে, চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে, নীতি ও নিয়মানুবর্তিতাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড়ো ভাবিলে, বাগাড়ম্বর অপেক্ষা নীরব কার্যকে সাধনার লক্ষ্য করিলে,—জাতি অমর অজেয় হয়।”

(হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ আদর্শ ভারতীয় মাধ্যম

অমিত ঘোষদস্তিদার

বেদের অভ্যন্তরে নিহিত থাকা ভক্তির বীজ মধ্যযুগের ভারতে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিবাদের কথা বলেছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—এই তিন পথের যেকোনো একটি দিয়েও মুক্তিলাভ করা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও ভক্তিবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সমন্বয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্মিক অন্তরঙ্গতা বিষ্ণুপুরাণে প্রতিপাদিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ জানাচ্ছে, যারা অজ্ঞতার মোহে আচ্ছন্ন তারা হরি এবং হর-এর ভেদ দর্শন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিনি হরি তিনিই হর, দুইয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। —"ত্বয়া যদভয়ং দত্তং তদ্‌দত্তমখিলং ময়া।/ মত্তোহবিভিন্নমাত্মানং দ্রষ্টুমর্হসি শঙ্কর।।/ যোহহং স ত্বং জগচ্ছেদং সদেবাসুরমানুষম্।/ অবিদ্যামোহিতাত্মানঃ পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ।। (৫।৩৩।৪৭-৪৮)। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তীকালে সহজযানী বৌদ্ধধর্মেও ভক্তির কথা বলা হয়েছে। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন বা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের মিলনই ভক্তিবাদের মূল কথা।

খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই প্রকৃতপক্ষে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়। শৈব নায়নার তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা শিবের পূজার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। আলওয়ার তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বিষ্ণুর পূজার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ভক্তিবাদ এক ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নেয়। ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন রামানন্দ। প্রয়াগের কাছে মালকোটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক রামানুজের শিষ্য ছিলেন। সম্ভবত খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ ও পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগ ছিল রামানন্দের জীবিত কাল। তিনি ছিলেন 'রামাৎ বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বৈষ্ণব সমাজের সাধারণ রীতি হলো রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করা। কিন্তু রামানন্দ রাম-সীতার উপাসনা করতেন। তাঁর শিষ্য রবিদাস ছিলেন চর্মকার, কবির ছিলেন জোলা, সোনা ছিলেন নাপিত এবং সাধন ছিলেন কসাই। বহু নারী রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিংবদন্তি অনুসারে কবির ছিলেন এক বিধবা ব্রাহ্মণীর সন্তান। তাঁর পালকপিতা ছিলেন এক মুসলমান তাঁতি বা জোলা। পরবর্তীকালে কবির জোলাবৃত্তিই গ্রহণ করেছিলেন। কবির সুলতান সিকন্দর লোদির (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রিঃ) সমসাময়িক ছিলেন। হিন্দুদর্শন ও সুফি সন্তদের শিক্ষা কবিরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গুরু রামানন্দের কাছে প্রেম ও ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। কবির বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র মনের পবিত্রতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে ভক্তির সাহায্যেই প্রকৃত ধর্মলাভ সম্ভব। সহজ সরল হিন্দি ভাষায় তিনি তাঁর উপদেশবাণী বা দোঁহা রচনা করেছিলেন। দোঁহা মূল্যবান আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং হিন্দি সাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ। রামচন্দ্রের উপাসক দাদুদয়াল বা দাদু (১৫৪৪—১৬০৩ খ্রিঃ) হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। সম্রাট আকবর দাদুকে খুবই মান্য করতেন। দাদুর পিতা লোদি রাম ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান, তিনি ধুনুরি ছিলেন। তিল্য, মোহন দফতরি, রজ্জব দাস, ছোট সুন্দর দাস দাদুর শিষ্য ছিলেন। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খ্রিঃ) ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক। ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের লাহোর জেলার রাভি নদীর তীরে তালবন্দি গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'সৎ-শ্রী-আকাল' অর্থাৎ সতস্বরূপ ভগবানের আরাধনাই

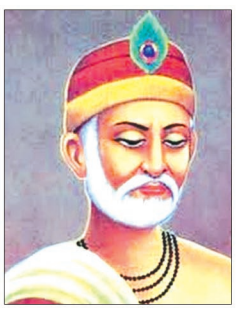
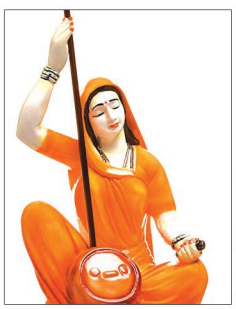

ছিল নানক প্রবর্তিত ধর্মের মূলমন্ত্র। 'নাম' বা ঈশ্বরের গুণগান, 'দান' বা জীব-সেবা এবং 'স্নান' বা দেহশুদ্ধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব বলে নানক মনে করতেন। 'শিখ' শব্দের অর্থ 'শিষ্য'। তাঁর উপদেশাবলী সংকলিত করে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থসাহেব' রচিত হয়।

ভক্তিবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬–১৫৩৩ খ্রিঃ)। নবদ্বীপের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বাইশ বছর বয়সে বৈষ্ণবগুরু ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা নেন। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৈষ্ণবধর্মে মূলমন্ত্র বৈরাগ্য, বিশুদ্ধপ্রেম, ভক্তি ও জীবে দয়ার আদর্শ প্রচারে তিনি ব্রতী হন।

ওড়িশা-রাজ প্রতাপরুদ্রদেব, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, জীব গোস্বামী, রূপ-সনাতন, যবন হরিদাস ছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদ প্রচারে বৈষ্ণবগুরু বল্লভাচার্য-র অবদান অবিস্মরণীয়। ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের এক তেলুগু পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বল্লভাচার্য মনে করতেন শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং জীবের প্রতি প্রেম—সারা জীবন ধরে এই দুই আদর্শ পালন করলেই মোক্ষলাভ করা যায়। তিনি ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের টীকা রচনা করেন। একেশ্বরবাদের উপর 'শুদ্ধ অদ্বৈত' নামের বিখ্যাত গ্রন্থটি তাঁর রচনা।

রাজপুতানায় কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন রাজপুত কুলগৌরব শিশোদীয় রাজপরিবারের বধু মীরাবাঈ। গানের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করতেন। ভারতের সাহিত্য-সঙ্গীতের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ 'মীরার ভজন'। মারাঠি ধর্মাচার্য নামদেব পশ্চিম ভারতে ভক্তিবাদ প্রচারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। স্বচ্ছ হৃদয়দৃষ্টি দিয়ে হরিনামের মাধ্যমে মুক্তিলাভই ছিল নামদেবের মূল আদর্শ। নামদেব ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ভক্তিবাদ আন্দোলন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ভাষা সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীতের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। বহু তত্ত্ব ও তথ্য নানাদিক দিয়ে নানাভাবে প্রচারিত হওয়ার ফলে জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে এক শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতের প্রতি বিশ্বমানসে এক আত্মিকটানের অনুভূতি জেগে ওঠে।

হিন্দুধর্মের উদারনৈতিক সংস্কার যখন ভক্তিবাদের মাধ্যমে এগিয়ে চলছিল, তখন ইসলামেও এক উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দুবেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দু যোগ সাধনা, 'অমৃত-কুণ্ড' নামক মূল্যবান গ্রন্থ সমতুল্য অন্যান্য গ্রন্থ ইত্যাদি আদর্শজাত মতবাদই সুফিবাদের জন্ম দেয়। মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার যে সমস্ত জ্ঞানী ও ভাববাদী মানুষ ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলাম নির্দিষ্ট নিয়ম, পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন, তাঁরাই পরবর্তীতে সুফিবাদ আন্দোলন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ব্রতী হন; ভারতেও সুফিবাদের প্রভাব যথেষ্ট আন্দোলিত হয়েছিল। 'সুফি' কথাটি বিশেষজ্ঞরা নানভাবে ব্যাখ্যা করেন। কেউ বলেন, 'সাদা' অর্থাৎ পবিত্রতা থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। কেউ বলেন, 'সাফ' বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের মধ্যে শীর্ষ বা প্রধান এমন কথার অর্থ থেকে 'সুফি' কথাটির উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন, 'সুফ' অর্থাৎ পশম। পশমের বস্ত্র দ্বারা যে সমস্ত ভক্তিবাদীরা নিজেদের আচ্ছাদিত রাখেন তাঁরাই হলেন 'সুফি'। সুফিবাদে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুরুকে বলা হয় 'পির' বা 'খাজা'। পির বা খাজা-র কর্মকেন্দ্রকে বলা হয় 'দরগা' বা 'খান্‌কা'। সুফি ধর্মের অনুগামীদের 'ফকির' বা 'দরবেশ' বলা হয়। ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, দারিদ্র্য, কৃচ্ছ্রসাধনা, উপবাস, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে সবচিন্তা ত্যাগ করে শুধুমাত্র ঈশ্বর চিন্তাই সুফিবাদের আদর্শ। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি, শেখ কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া উল্লেখযোগ্য সুফি-সন্ত ছিলেন। বিখ্যাত কবি আমির খসরু এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনি, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। পঞ্জাব, মুলতান ও বাঙ্গলায় 'সুহ্‌রাবর্দি' সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সন্ত ছিলেন শেখ শিহাবউদ্দিন সুহ্‌রাবর্দি ও হামিদউদ্দিন নাগোরি। পঞ্চদশ শতকে ভারতে কাদিরি, শাত্তারি, নকশবন্দী, কালন্দর প্রভৃতি সুফি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল। সুফিবাদের মাধ্যমে হিন্দিভাষা এবং কাওয়ালি সঙ্গীতের খুবই উন্নতি ঘটে। সুফি-সন্তরা ভারতবর্ষকে তাঁদের স্বদেশ ও ভারতবাসীকে তাঁদের স্বজন বলে মনে করতেন।

ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ মানুষকে আত্মীয় করে নেয়। প্রেমের বন্যায় ভক্তি ও ভালোবাসায় মানুষ মানুষের কাছে আসে। মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। একে জাগ্রত করে তুলতে পারলে ভারতের উদ্দীপ্ত মানুষের প্রতিভা ধর্মে-দর্শনে-সাহিত্যে-সঙ্গীতকলায় আরও জাগরণ ঘটিয়ে দেবে। আর তা করতে পারলে জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে এক শ্রদ্ধাশীল মনোভাব সৃষ্টির প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। মজবুতভাবে ঘটে যাবে ভারতীয়করণ। দিনে দিনে এই ভারতীয়করণের আদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক এবং পরিপূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্যে গড়ে উঠুক মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের মিলনের এক পবিত্র সেতু। জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম—গীতার এই তিন পথ খোলা থাকুক মানুষের দিকে, এই তিনপথের মিলিত রূপ সমস্ত অশান্তির অবসান ঘটিয়ে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করুক। বেদের মধ্যে থাকা ভক্তির বীজ আজ পুনরায় মহীরুহ হয়ে উঠুক। এই কামনা এবং বাসনা এগিয়ে চলুক মানুষ থেকে মানুষের দিকে। ■

নরেন্দ্র মোদীর এই জয় ভারতের কোটি কোটি মানুষের জয়

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিপুল জনাদেশ নিয়ে ফিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দল ভারতীয় জনতা পার্টি। এই রকম অভূতপূর্ব জয় স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। কোনও সহানুভূতির হাওয়ায় ভর করে নয়— কর্মদক্ষতা, সততা ও নির্ভেজাল দেশপ্রেম এই উত্তুঙ্গ সাফল্যের কারণ।

বিরোধী দলগুলির একটাই অ্যাজেন্ডা ছিল, 'মোদী হঠাও'। কারণটা পরিষ্কার। বিরোধী দলগুলির ভ্রষ্টাচারের পথে মোদীজী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং তাঁকে হঠাতে হবে। এদের কোনও সর্বসম্মত নেতা ছিল না, কোনও সুস্পষ্ট নীতি বা আদর্শ ছিল না, শুধু ছিল ক্ষমতার লোভ, ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা। ভারতের আমজনতা এদের আসল রূপটা ধরে ফেলেছে। তাই তারা এদের ফাঁদে পা না দিয়ে দু'হাত তুলে মোদীজীকে আশীর্বাদ করছেন ও ভরসা দিয়েছেন।

এবার বহু রাজনৈতিক পণ্ডিতের হিসাবে গরমিল হয়ে গেছে, তাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী মেলেনি। ভারতের নবীন প্রজন্ম, যারা নতুন ভোটার, তারা মোদীজীর উপরেই আস্থা রেখেছে, অন্য কারও ওপরে নয়। জাতপাত, সম্প্রদায়, ধর্মবিশ্বাস সবকিছুর উপরে উঠে মোদীজী দেশ গড়ার, নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন, সেই ডাকে মানুষ সাড়া দিয়েছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এই মন্ত্র যাঁর, তার উপরে ভরসা না করে পারা যায় না! তাই এই বিপুল জয়।

ভারত বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু সম্প্রদায়ের দেশ, কিন্তু মূল সুর একটাই। সেটি হচ্ছে ভারতীয়ত্ব যা একটি বহু প্রাচীন এবং অতি উন্নত এক সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে

দেশকাল

চলেছে। যার মূল সুর 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ'— সবাই সুখে থাকুক, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'— সারা পৃথিবী আমার আপনজন।

মোদীজীর এই বিপুল জয় আবার প্রমাণ করল যে ভারতীয় কৃষ্টি অপরাজেয়, অবশ্যই অবিনশ্বর। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এ দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষ, অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষ আজ সমাজ- সচেতন, রাজনৈতিক ভাবে সচেতন। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর তাদের ভোলাতে পারছে না। মোদীজী যথার্থই বলেছেন, এই জয় তাঁর জয় নয়, এই জয় গণতন্ত্রের জয়, ভারতের মানুষের জয়।

দুঃখের কথা হলো, কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এই বিপুল জয়টা মেনে নিতে পারছে না। এক্সিট পোল যখন ফলপ্রকাশের আগেই ভোটের ফলাফল সম্বন্ধে আভাস দিয়েছিল, তখনই তারা ইভিএমের বিরুদ্ধে 'রে রে' করে আসরে নেমে পড়েছিল। চন্দ্রবাবু নাইডু মহা উৎসাহে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের দরজায় দরজায় কড়া নাড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। বেচারা চন্দ্রবাবু! নিজের প্রদেশ অন্ধ্রের মানুষরাই যখন তাঁকে রিজেক্ট করল, তখন বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করলেন, অবশ্যই ভোটের ফল প্রকাশের পরে। 'নিয়তি কে ন বাধ্যতে।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও কম যান না। প্রধানমন্ত্রী হবার উদগ্র বাসনা তাঁকে বাস্তব পরিস্থিতি ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ধাক্কাটা খেলেন নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে। বেয়াল্লিশটা আসনের মধ্যে মাত্র বাইশটা আসনে জয়লাভ করলেন, আর বিজেপি পেল আঠারোটি আসন। দেশের প্রধান মন্ত্রীকে কদর্য ভাষায় গালি দিয়ে গেছেন আমাদের মাননীয়া। প্রকাশ্য জনসভায় বলছেন যে মোদীজীকে তাঁর থাপ্পড় মারতে ইচ্ছা হয়। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে অপছন্দ করতেই পারেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদের কোনও সম্মান নেই তাঁর কাছে?

এসব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভালো

ভাবে নেয়নি। জননেতা বা নেত্রীর মুখে কুরুচিপূর্ণ ভাষা তারা বরদাস্ত করে না, ভোটের ফলেই তা প্রমাণিত।

মোদীজীর এই বিপুল জয়ের পেছনে মুসলমান মহিলাদেরও অবদান অনেক। তিন তালাক প্রথা রদ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তাঁদের সম্ভাব্য লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি কুপ্রথা, যেটা ছিল মুসলমান মহিলাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর এবং পারিবারিক অনিশ্চয়তার প্রতীক, মোদীজী সেটি বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদানে এই মহিলারা তাঁকে ভোট দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা হয়ে মোদীজীর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

বহুকাল যাবৎ একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল যে দক্ষিণ ভারতে ভারতীয় জনতা দল ব্রাত্য, কারণ এই দল মূলত হিন্দি ভাষীদের দল। আচ্ছা, আপনারা বলুন তো কর্ণাটক কি উত্তর ভারতের একটি প্রদেশ? অথবা পশ্চিম ভারতের? নয়তো পূর্ব ভারতের? কর্ণাটক এবার বিপুল ভাবে মোদীজীকে সমর্থন জানিয়েছে। এর আগে বিধান সভা নির্বাচনেও বিজেপি সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস দল কর্ণাটকের স্থানীয় দল জে ডি এস-এর সঙ্গে রাতারাতি গাঁটছড়া বেঁধে সরকার গড়ে ফেলে। দেবেগৌড়ার পুত্র কুমারস্বামী সামান্য কটি ভোট পেয়েও মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসলেন। বিজেপি ১০৪টি আসনে জয়লাভ করেছিল, কংগ্রেস ৭৮টি আসনে জয়লাভ করে। এটা গত বছরের ঘটনা। বেচারা কুমারস্বামীর দলীয় শক্তি নেই বলে কর্ণাটক সরকারে তাঁর অবস্থা অনেকটা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' টাইপের। সরকারে ছড়ি ঘোরায় কংগ্রেস দল। মুখ্যমন্ত্রীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, এটা কার ভালো লাগে বলুন? যে কারণে আমরা টেলিভিশনের পর্দায় প্রায়শই কুমারস্বামীকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পাই। একটি বড়ো সাইজের রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন, এই দৃশ্য আমরা একাধিকবার দেখেছি। বোঝাই গেছে যে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান কংগ্রেসিদের কাছ থেকে মোটেই পাচ্ছিলেন না। এবার লোকসভা নির্বাচনে। কর্ণাটকের আটাশটি আসনের মধ্যে ২৫টিই গেল বিজেপির ঝুলিতে। তারা কর্ণাটকের আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে, আশা করা যায়।

আরেকটি দক্ষিণী দেশ তেলেঙ্গানা। সেখানেও ভারতীয় জনতা পার্টি ভালো ফল করেছে। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে দক্ষিণ ভারতেও মোদীজী ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। যেমনটা ভাবা গিয়েছিল, 'টুকরে টুকরে গ্যাঙের কানহাইয়া কুমার বেগুসরাই থেকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে। মানুষ এই সব দেশদ্রোহীদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনে দাঁড়াবার সাহস এদের হয় কী করে? আশা করি ধাক্কাটা খাওয়ার পর এদের চৈতন্য হবে।

চলচ্চিত্র অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় আশা করি তাঁরও চোখ খুলে দেবে। আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ধৃষ্টতা দেখানোর শাস্তি জনগণ তাঁকে দিয়ে দিয়েছে।

সব থেকে চমকপ্রদ ফল হয়েছে উত্তরপ্রদেশের আমেথিতে। আমেথি কেন্দ্রটি নেহরু-গান্ধী-বঢরা পরিবারের খাস তালুক বলা যায়। আমেথি এই পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতোই ছিল। এবার সেখানকার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে বংশানুক্রমিক রাজত্বের দিন শেষ। বিজেপির স্মৃতি ইরানি বিপুল ভোটে জিতেছেন, পরাজিত হয়েছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী। আমেথির মানুষ নেহরু-গান্ধী-বঢরা পরিবারের একচেটিয়া জমিদারির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, এটাই প্রমাণ হলো।

মোদীজীর উদ্দেশে যারা লাগাতার কুৎসা রটনা করে এসেছে, গালিগালাজ দিয়ে এসেছে, এবারের নির্বাচনের ফলাফল তাদেরকে হতাশ করবে, নিঃসন্দেহে। ছদ্ম-সেকুলার লবি, যারা নিজেদের বিশাল ইন্টেলেকটুয়াল বলে মনে করে এবং মনে করে তাদের মতো প্রগতিশীল পৃথিবীতে বিরল, এবার তাদেরও ভারতের মানুষ সবক শিখিয়ে দিল। আশা করি এই নির্বাচনের ফলাফল বিদেশে টিকিবাঁধা অমর্ত্য সেনদের মতো তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দলকে কিছুটা শিক্ষা দেবে। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

পোস্টাল ব্যালটেও নাস্তানাবুদ মমতা

রণিতা সরকার

গণতন্ত্রের থাপ্পড়টি যে এভাবে নিজের কাছেই ফিরে আসবে তা ঘুণাক্ষরেও হদিশ পাননি তৃণমুল সুপ্রিমো। কার্যত ভোটব্যাঙ্কের ফাঁকা ঝুলি নিয়ে তাকে যেমন ফিরতে হয়েছে, তেমনই দারুণ ফল করে নিজেদের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে গেরুয়া শিবির। কথায় বলে— 'আগে ঘর তারপর বাহির'— প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে তিনি এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে তার ঘরটি আর সামলানো গেল না। আর এই সুযোগে মোক্ষম জবাবটি দিল গেরুয়া শিবির।

ইভিএম ভোটের পাশাপাশি নজিরবিহীন ভাবে পোস্টাল ব্যালটেও যার প্রভাব বিলক্ষণ পড়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শুনে আসা সরকারি কর্মচারী, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকা থেকে শুরু করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত প্যারাটিচার সকলেই তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছে পোস্টাল ব্যালটে। 'ডিএ'-কে 'দয়ার দান' বলে উল্লেখ করা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির চরম অপমান যে তাঁরা ভোলেনি আক্ষরিক অর্থে তার প্রমাণ দিলেন। পে-কমিশনের নামে যে চূড়ান্ত বিলম্ব তৈরি হয়েছে তাতে শাসকদলের উপর কর্মীরা আর আস্থা রাখতে পারেনি।

খেলা, মেলার নাম করে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, অথচ কর্মীদের তাদের যোগ্য পারিশ্রমিকটুকু দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দুর্নীতিও এর একটি বিশেষ কারণ বলে উল্লেখ করা যায়। শিক্ষা দপ্তরের বঞ্চনার শিকার অহরহ হতে হচ্ছে কম্পিউটার টিচার থেকে শুরু করে প্যারা টিচারদের। সময় বয়ে গেছে কিন্তু সরকারের দেওয়া ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি।

ফি বছর শীতকালীন সময়ে পাড়ার ক্লাবগুলিকে লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া যেতে পারে, অবলা, সবলা মেলার নাম করে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষকে তোষণ করা যেতে পারে, অথচ কর্মীদের যোগ্য পারিশ্রমিক দিতে দিদির যত আপত্তি। তথাকথিত এই উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল করা হয়েছে পুজোয় ক্লাবগুলিকে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে। হায়রে গণতন্ত্র! সরকারি কর্মীরা যাদের হয়ে সারা বছর মুখে রক্ত তুলে কাজ করবে তারাই যদি তাদের এতটুকু পাশে না দাঁড়ায়, তাহলে গণতন্ত্রের থাপ্পড়টি খেতে হয় বই কি!

আমরা এমনই এক অদ্ভুত রাজ্যে বাস করছি যেখানে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হলে লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই রাজ্যেরই সপ্তম বেতন কমিশনের প্রস্তাব সুপারিশ করতে বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে কেন্দ্রের কর্মীদের প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, পে-কমিশন সবই হচ্ছে। দিনের শেষে রাতে তারা শান্তিতে ঘুমাতে যেতে পারছে এই ভেবে যে, সারা দিনের পরিশ্রম সার্থক হচ্ছে, স্বীকৃতিস্বরূপ তারা তাদের বেতন পাচ্ছে।

এইসব কারণেরই যোগ্য জবাব পেয়েছে রাজ্য সরকার। ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় ৪০টিতেই পোস্টাল ব্যালটে কার্যত অনেক পিছিয়ে শাসকদল। যেখানে বিজেপির ভোট চারসংখ্যায় পৌঁছে গেছে, সেখানে তৃণমূলকে তিন সংখ্যার মধ্যেই আটকে থাকতে হয়েছে। বীতশ্রদ্ধ, রাগের প্রতিফলন ঘটেছে তাদের ভোটে। তবুও এই হার থেকে শিক্ষা নেওয়া তো দূরের কথা, খাঁড়ার ঘা-এর মতো আবার আঘাত হানলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ২৭ মে ষষ্ঠবেতন কমিশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলো, সরকারের পক্ষ থেকে আবার সেই মেয়াদ সাত মাস বাড়ানো হলো। এই নিয়ে পর্যায়ক্রমে পাঁচবার এই মেয়াদ বাড়ানো হলো। বিদ্বজ্জনদের কথায়— 'পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম'— কিন্তু অতিরিক্ত অহংবোধ, ঔদ্ধত্যে শাসকদলের পা যে আর মাটিতে নেই তা তাদের এই কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে— মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের উপর প্রতিশোধ নিলেন।

লোকে বলে, পাগলেও নিজের ভালো বোঝে। 'বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ' বলতে যা বোঝায় শাসকগোষ্ঠীর অবস্থা এখন সেই রকম। তারা ভেবে নিচ্ছে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটই শেষ, সামনে ২০২১-এ বিধানসভা ভোটটি অপেক্ষা করে আছে তা দিদি ভুলে গেছেন। এই ভাবে চলতে থাকলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে যে শুধু সময়ের অপেক্ষা, তা বোধ করি সবাই আঁচ করতে পারেন।

সরকারি কর্মচারীরা একটি মজবুত সরকারের পক্ষে। সঠিক বিকল্প যেমন খুঁজে নিয়েছেন, ঠিক তেমনই এই স্বৈরাচারী সরকারকে ছুঁড়ে ফেলতে তাদের বেশি সময় লাগবে না। রাজনীতি সচেতন, শিক্ষিত চাকুরিজীবী মানুষরা যত শাসকদলের বিরোধী হবে ততই মজবুত হবে লোকসভা ভোটে রাজ্য থেকে সব থেকে ভালো ফল করা বিজেপির। তাদের হাতে মজুত আছে কঠিন অস্ত্র। তারা এটুকু বলে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে পারবে— কেন্দ্রে তাদের সরকার তারা কর্মীদের যোগ্য সম্মান, পারিশ্রমিক দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

সমাজের শিক্ষিত, চাকুরিজীবী মানুষরা এভাবে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলে, সমাজের অন্য অংশের মানুষরাও এটাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়েই এগোবে। শিক্ষিত সমাজের কাছে সবসময় কাম্য উন্নত, মেদহীন, দুর্নীতিমুক্ত সরকার, যেটি বর্তমান রাজ্য সরকার দিতে অপারগ। তাই তারা এগিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রীর ঔদ্ধত্যের যবনিকা পতনে শামিল হয়েছেন। ■

সমাজের শিক্ষিত, চাকুরিজীবী মানুষরা এভাবে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলে, সমাজের অন্য অংশের মানুষরাও এটাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়েই এগোবে। শিক্ষিত সমাজের কাছে সবসময় কাম্য উন্নত, মেদহীন, দুর্নীতিমুক্ত সরকার, যেটি বর্তমান রাজ্য সরকার দিতে অপারগ।

দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প

১৮৫৩ সাল। ক্রিমিয়ায় ভয়ংকর যুদ্ধ চলছে। ১৮ হাজারেরও বেশি সৈন্য মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি। শুধু নামই হাসপাতাল। নেই কোনও পরিষেবা। এমনকী পানীয় জল পর্যন্ত নেই। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে

সৈনিকরা। লন্ডনে বসে খবর পেলেন একজন নার্স। বেশ কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে একটি দল তৈরি করে ছুটে এলেন ক্রিমিয়ায়। মায়ের মমতায় আহত সৈনিকদের সেবা করতে লাগলেন। তাঁর বান্ধবীরা যখন সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে রেড়ির তেলের বাতি হাতে এক একজন সৈনিকের বিছানার পাশে পাশে ঘুরতে। কারো মুখে জল দিচ্ছেন, পরম মমতায় কারো মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, কাউকে ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছেন। সেবা যেন তাঁর জীবনব্রত। দিদির মমতা নিয়ে তিনি যেন ভাইদের স্নেহ বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। সৈনিকরা তাই তাঁকে সম্বোধন করছেন সিস্টার বলে। তাঁর নামই হয়ে গেল 'দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'।

মহীয়সী এই সেবিকার নাম ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। ১৮২০ সালের ২০ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিংগেল ও ফ্রান্সিস নাইটিংগেলের ঘর আলো করে আসেন তিনি। মাত্র এক বছর বয়সে তাঁরা ইংল্যান্ডে চলে আসেন। তাঁর বাবা ছিলেন দুটো স্টেটের মালিক এক ধনী ভূস্বামী। সন্তানের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন যেমন সচেতন তেমনি উদার। ছোটোবেলাতেই নাইটিংগেল গণিত, সংগীত, জার্মান, ফরাসি, ইতালিয়ান ভাষা সহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে সেবার প্রতি টান অনুভব করেন। এই টানকে তিনি 'ঈশ্বরের ডাক' মনে করতেন। কিন্তু সেবাকে জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করার কথায় পরিবার থেকে প্রবল আপত্তি আসে। তখনকার সমাজে নার্সিং ছিল দরিদ্র, অসহায় বিধবা মহিলাদের পেশা। পরিবারের প্রবল আপত্তি ও সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে গিয়ে এই ধনী, সুন্দরী, শিক্ষিতা ব্রিটিশ তরুণী শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে নার্সিংয়ের কৌশল ও জ্ঞানে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে লাগলেন। তিনি জার্মানির ক্যাথলিক কনভেন্ট নার্সিং ট্রেনিং স্কুল এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় সেন্ট ভিনসেন্ট সোসাইটির হসপিটালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিশ্বের নার্সিং কর্মকাণ্ডের তিনি পথিকৃৎ। এই পরিষেবাকে তিনিই সেবাধর্মে উন্নীত করেন। জীবনে অসংখ্য পদক ও উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ১৮৫৯ সালে তিনি রয়্যাল স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটির প্রথম সারির সদস্য নির্বাচিত হন। লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে নার্সিংকে সম্পূর্ণ পেশারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৮৬০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'নাইটিংগেল ট্রেনিং স্কুল' যার বর্তমান নাম 'ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল স্কুল অব নার্সিং'। তিনি তাঁর 'নোটস অন নার্সিং' পুস্তকে রোগীর জন্য করণীয় ও অকরণীয় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশেষ কয়েকটি কথা নার্সদের মনে রাখতে বলেছেন। (১) রোগীর ঘরের পর্দা সরিয়ে দিতে হবে। (২) ঘরে সূর্যকিরণ ও মুক্ত বাতাস আসতে দিতে হবে। (৩) জানালার কাছে রোগীর বসার চেয়ারটি পরিষ্কার রাখতে হবে। (৪) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করতে হবে। (৫) রোগী ও নার্স দুজনকেই পরিষ্কার থাকতে হবে।

তিনিই পথম সেবিকা যাঁর বিশাল অবদান রয়েছে ভারতীয় নার্সিং পরিষেবায়। শুধু আর্মি নয়, সাধারণ জনগণের সেবায় তাঁর অবদান অপরিসীম। ১৮৬৫ সালে তাঁর প্রদত্ত ' সাজেশন অন এ সিস্টেম অব নার্সিং ফর হসপিটাল ইন ইন্ডিয়া' খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁরই আগ্রহে নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্য ভারত থেকে গ্র্যাজুয়েটদের পাঠানো হয় ইংল্যান্ডের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে। তাঁর আদর্শে, তাঁর প্রতিনিধিত্বে ১৮৬৭ সালে প্রথম দিল্লির সেন্ট স্টিফেন হসপিটালে নার্সিং ট্রেনিং শুরু হয়।

তিনি বিশ্বের মেয়েদের উদ্দেশে বলে গেছেন, 'মেয়েরা সহানুভূতির আশা করে, কিন্তু নিজেদের পুরুষের মতো যোগ্য করে তোলে না।' এই অসাধারণ মানবী ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট লোকান্তরিত হন।

—শিপ্রা সেন

ভারতের পথে পথে

অমরকণ্টক

মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্যপর্বতের সর্বোচ্চ শিখর মেখল পাহাড়ে পুণ্যতোয়া নর্মদার উৎপত্তিস্থল, মুনিঋষিদের তপোভূমি এবং প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ এই অমরকণ্টক। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধে বহু দেবতার বিনাশ হয়েছিল, তাই 'অমরাণাং কটঃ' থেকে অমরকণ্টক নামের উৎপত্তি। নবম শতকে এখানে রেওয়ার মহারাজা গুলাব সিংহ নর্মদা মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরে তিনফুট উচ্চতার শ্বেতপাথরের নর্মদা মাইয়ার মূর্তি রয়েছে। পাশেই রয়েছে পাতালেশ্বর শিবমন্দিরে জলের তলায় নর্মদেশ্বর অমরনাথ। তারও পাশে রয়েছে ২৭টি মন্দিরের টেম্পল কমপ্লেক্স। এছাড়া রয়েছে মনসা, কার্তিকেয়, গোরক্ষনাথ, রোহিণী, বালাসুন্দরী ও শ্রীদুর্গার মন্দির। মন্দিরগুলির মাঝখানে ধাপে ধাপে সিড়ি নেমে গেছে এগারো কোণের মার্কণ্ডেয় কুণ্ড বা কোটিতীর্থে। বামপাশে 'নর্মদা মাইয়া কি উদ্‌গম স্থল'। নর্মদা নদীর উৎপত্তির দিন শিবচতুর্দশী ও নাগপঞ্চমীতে সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হয়। এর ৭কিলোমিটার দূরে রয়েছে কপিলধারা, ভৃগু কমণ্ডলু, দুগ্ধধারা ইত্যাদি নানা মন্দির।

জানো কি?

পুরো নাম

- GPRS— General Pocket Radio Service.
- GPS— Global Positioning System.
- DVD— Digital Vidio Disk.
- LED—Light Emitting Diode.
- COMPUTER--Common Oriented Machine. Particularly United and used under Technical and Educational Research.
- VIRUS— Vital Information Resources Under Siege.

ভালো কথা

লিচু খালিপেটে নয়

দু'বছর আগে আমাদের এলাকায় লিচু খেয়ে বেশ কটি শিশু মারা গিয়েছিল। অনেক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ভয়ে এলাকার মানুষ লিচু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। পরে মালদা সদর হাসপাতালের এক ডাক্তারবাবু বলেছেন, লিচু খালিপেটে খাওয়ার ফলেই এরকম হয়েছে। এবার লিচু পাকার আগেই অরুণদাদা আমাদের বালক বাহিনীকে ডেকে বলেছিল যে, লিচুতে কোনও দোষ নেই, শুধু সকালে খালি পেটে একেবারে ছোটোরা যেন না খায়। এবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মায়েদের সচেতন করতে হবে। সেভাবে আমরা সব বাড়িতে মায়েদের বলেছি। মায়েরা এবিষয়ে খেয়াল রেখেছে। আমরাও সপ্তাহে একদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি। খুবই আনন্দের বিষয়, এবার কোনও শিশু লিচু খেয়ে অসুস্থ হয়নি। অরুণদাদা বলেছে, লিচু খুবই পুষ্টিকর কিন্তু কোনও মতেই খালিপেটে খাওয়া চলবে না। বড়োরাও না খেলে ভালো।

প্রকাশ মণ্ডল, দশম শ্রেণী, দুইশতবিঘি, গোলাপগঞ্জ, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

রসাল

কৌশিক সাহা, দ্বাদশ শ্রেণী, পরানপুর, মালদা

গাছে গাছে হলুদ বরন
বাগান ভারছে
কত জাতের বলা মুশকিল
বাজার ভরেছ।
তারই লোভ আমরা দুভাই
ছুটি হলেই মালদা যাই,
মানের সুখে শুধু খাই
মজা শুধু মজাই পাই।

বন্ধুরা শুনে অবাক হয়
এত জাতের এত হয়!
চোখ দুটি তাদের ছানাবড়া
উপায় নেইকো হাহুতাশ ছাড়া।
কীসের কথা ভেবে পাচ্ছ না
ভাবতে থাকো আরও ভাবো না,
অবস্থা তোমাদের বড়ই বেহাল
শুনে নাও সে যে বড়ো বড়ো রসাল।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২৬।।

ভয় পেয়ে তক্ষক নিশ্চয় ইন্দ্র'র আশ্রয় নিয়েছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৪০তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ৩০শে জুন, ২০১৯

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

শোক সংবাদ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া গুড়চাকলি গ্রামের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক সহদেব মাইতির মাতৃদেবী সত্যভামা মাইতি গত ১০ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা কার্যবাহ পলাশ দাসের বাবা কৃষ্ণচন্দ্র দাস গত ১৩ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঝাড়গ্রাম জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা ঝাড়গ্রাম জলা কার্যকারিণীর সদস্য অমলেন্দু দাসের সহধর্মিণী গীতা দাস গত ৬ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বর্ধমান নগরের বাদামতলার স্বয়ংসেবক তপন রুদ্র গত ১৮ মে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েচিল ৬৪ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ বিকাশ মণ্ডলের মাতৃদেবী কাঞ্চন মণ্ডল গত ১৪ মে পরলোকগমন করেন। তিনি ১ পুত্র, ৬ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ২৭ মে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত রোগে লোকান্তরিত হলেন মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক আশুতোষ বর্মন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি মালদা নগরের বীর সাভারকর শাখায় বাল্যকালেই স্বয়ংসেবক হন। শিশু গণশিক্ষক থেকে শাখার মুখ্যশিক্ষক, কার্যবাহ, নগরের সায়ম্ বিভাগ কার্যবাহের দায়িত্ব তিনি সফলভাবে পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কোচবিহার নগর প্রচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে শিলিগুড়ি জেলা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১২ বছর প্রচারক জীবন অতিবাহিত করার পর বাড়ি ফিরে এসে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে 'সংবেদন' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার হিসেব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অকৃতদার আশুতোষ বর্মনের অকাল প্রয়াণে মালদা নগরের স্বয়ংসেবকরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। গত ৩ মে মালদা নগরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আয়োজিত শোকসভায় বহু স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার নুঙ্গির প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের অন্যতম কার্যকর্তা সোমেন দাস গত ১৭ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, নাতি-নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। প্রয়াত দাস পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব তাঁর পূর্ববঙ্গই কেটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস জগন্নাথ হলে থেকে তিনি এমএ পাশ করেন। একাত্তরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। পরে তাঁরা বাধ্য হয়ে সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এখানেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদর দায়িত্বও পালন করেছেন। স্বস্তিকার প্রচার-প্রসারকে তিনি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরিশ্রমী ও সদালাপী মানুষ হিসেবে এলাকায় তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে এলাকার মানুষ শোকস্তব্ধ। ■

লোকান্তরিত বাংলা কল্পবিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র

গত ২৭ মে লোকান্তরিত হলেন বাংলা কল্পবিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অদ্রীশ বর্ধন। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালের ১ ডিসেম্বর কলকাতার এক শিক্ষক পরিবারে। প্রথম দিকে চাকরি, ব্যবসা ও সাহিত্যসাধনা নিয়েই ছিলেন। নামি একটি প্রতিষ্ঠানের পারচেজ ম্যানেজারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি চলে আসেন লেখার জগতে। গোয়েন্দা কাহিনি দিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর সৃষ্ট পুরুষ গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র ও মেয়ে গোয়ন্দা নারায়ণী বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি একাধিকবার স্বস্তিকার শারদীয়া সংখ্যায় রহস্য উপন্যাস লিখেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে প্রথম ' সায়ান্স ফিকশন সিনে ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পত্রিকা, রেডিয়ো, ফিল্ম ক্লাবের মাধ্যমে কল্পবিজ্ঞানকে আন্দোলন আকারে সংগঠিত করেন। বহু পুস্তকের রচয়িতা তিনি। জীবনে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

শ্যামসুন্দরের ফেভারিট ওয়েস্ট ইন্ডিজ

শ্যামসুন্দর মিত্র নামটি একালের ক্রিকেটপ্রেমীরা শুনলে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে পারেন হয়তো। কিন্তু যদি বলা হয় টেকনিকের বিচারে বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে তাকে চিহ্নিত করে গেছেন ক্রিকেট কোচিংয়ের শেষ কথা কার্তিক বসু, তাহলে সেই বিস্ময়ভাবই বদলে যেতে পারে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায়। সেই শ্যামসুন্দর মিত্র এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে নানা অভিনব ভাবনা মেলে ধরলেন---

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন : চলমান বিশ্বকাপে ফেভারিট কোন দেশ, কাপ জেতার পক্ষে?

শ্যামসুন্দর : আমি বরাবরই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট ও তার দর্শনে শ্রদ্ধাশীল। ক্যারিবিয়ানরা ক্রিকেটটা খেলে চূড়ান্ত আবেগ ও হৃদয়বত্তা দিয়ে। তাই মানুষ হিসেবেও ওরা বড়ো সহজ-সরল। ক্রিকেট এক অর্থে জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ। এই নেভিল কার্ডাসীয় দর্শন থেকে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দেখলে মনে হয় যেন জীবনের বহুবর্ণ রূপকে প্রতিবিম্বিত করা হচ্ছে সবুজ ক্যানভাসে। আর এবারের টিমটা প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ী এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম মাঠে। বেশ কিছু শক্তিশালী 'ওয়ান ডে' ক্রিকেটার আছে ওদের দলে যারা যে কোনো পরিস্থিতিতে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। হোম গেইল, রাসেল, ব্রেথওয়েটেরা বড়ো বড়ো স্ট্রোক নিয়ে ছত্রখান করে দিতে পারেন উন্নত বোলিং লাইন আপকে। আলাজারি জোসেফ, শ্যানন গ্যাব্রিয়েলের পেস অ্যাটাকও যথেষ্ট ক্ষুরধার। অলরাউন্ডার তথা অধিনায়ক জেসন হোল্ডার কার্যকরী ব্যাটসম্যান ও ব্রেকথ্রু বোলার হিসেবে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন নিজেদের স্বপক্ষে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর আগে দুবার কাপ জিতেছে। তাই চ্যাম্পিয়ন হবার স্বাদ কীরকম তা ভালো রকমই জানে ওরা। সেই ইতিহাস ও দলীয় শক্তি তাদের হয়ে কথা বলবে।

প্রশ্ন : অন্যান্য দলের কীরকম সম্ভাবনা দেখছেন?

শ্যামসুন্দর : অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দল কাপ জেতার ব্যাপারে। ইংল্যান্ড নিজের দেশে খেলছে। অত্যন্ত ব্যালান্সড দল। ব্যাটিংয়ে যথেষ্ট গভীরতা আছে। অধিনায়ক মর্গ্যান যথেষ্ট সুকৌশলি। মর্গ্যান ও কোচ ট্রেভর বেলিস নানা রকম ট্যাকটিক্স নিয়ে মাঠে নামে। একটা কাজ না করলে আর একটা প্রয়োগ করে। এই ব্যাপারটায় ইংল্যান্ড অন্যান্য দলের চেয়ে এগিয়ে আছে। ইংল্যান্ডের পেস বোলিং সব দিক থেকেই ইংলিশ কন্ডিশনে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। অস্ট্রেলিয়া সাম্প্রতিক দুঃসময় কাটিয়ে আবার স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। স্মিথ, ওয়ার্নার দলে ফিরে আসায় দলটাকে অপ্রতিরোধ্য লাগছে। ইংল্যান্ড অনুশীলন ম্যাচে উড়িয়ে দিয়েছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে। ম্যাক্সওয়েলের মতো বুদ্ধিমান, দক্ষ অলরাউন্ডার ওদের একটা বড়ো সম্পদ আর ভারতীয় দল অবশ্যই আনপ্রেডিকটেবল। দুনিয়ায় এক নম্বর টিমকে হেলায় হারিয়ে দিয়ে দুর্বল, আন্ডার র‍্যাঙ্কিং টিমের বিরুদ্ধে হেরে বসল। এই ব্যাপারটা কাটিয়ে যদি ধারাবাহিকতা দেখাতে পারে তাহলে ভারতও কাপ জেতার বড়ো দাবিদার। ভারতও আগে দু'বার কাপ জিতেছে, সেই গরিমাবোধও ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভালো খেলতে উজ্জীবিত করবে।

প্রশ্ন : অত্যধিক ৫০, ২০ ওভারের ক্রিকেট কি টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষতি করছে?

শ্যামসুন্দর : মানুষ এখন চিন্তা-চেতনার চর্চাবৃত্ত থেকে স্নায়বিক উত্তেজনাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়। সিরিয়াস, সুদূরপ্রসারী সংস্কৃতির বদলে হাল্কা, রসালো সংস্কৃতি নিয়ে মেতে থাকতে ভালোবাসে। ক্রিকেটও তার ব্যতিক্রম হবে কেন। এই প্রজন্ম তো ৫০-৬০ দশকের টেস্ট ক্রিকেট দেখেনি। যদি ভিডিওতে দেখার সুযোগ পায় তাহলে বুঝতে পারবে স্যার গারফিল্ড সোবার্স, এভার্টন উইকস, পিটার মে, নীল হার্ভে, কেন ব্যারিংটন কোন জাতের ব্যাটসম্যান ছিল। তখন তারা এই প্রজন্মের ব্যাটসম্যানদের মন থেকে মুছে ফেলবে। একইভাবে ওয়েলেসলি হল, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, ডেনিস লিলির ভয়ংকর সুন্দর ফাস্ট বোলিং দেখলে মনে হবে এই যুগের বোলাররা যেন পাড়ার ক্রিকেটে বোলিং করছে। ৫০-৬০-৭০ দশকে টেস্ট ক্রিকেট যে উচ্চতায় পৌঁছে গেছিল, তা চিরকালীন রূপকথায় স্থান পেয়ে গেছে। তার সঙ্গে আজকের বেটিং সর্বস্ব ৫০, ২০ ওভারের ক্রিকেটের, তুলনা করাই পাপ। এই সময়ের কোনো ক্রিকেটারই আমাদের যুগে টেস্ট টিম কেন, কাউন্টি টিমেই স্থান পাবে না। সোবার্স, কানহাই, ডেক্সটার, ব্যারিংটন যদি আজকের যাবতীয় সুবিধে নিয়ে লিমিটেড ওভার ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত, তাহলে অকল্পনীয় সব রেকর্ডের জন্ম হতো।

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে ৫০, ২০ ওভারের ক্রিকেটের ভারসাম্য কীভাবে সম্ভব?

শ্যামসুন্দর : টেস্ট ক্রিকেট হলো ধ্রুপদী-সংগীত। ৫০, ২০ ওভারের ক্রিকেট হলো পপ মিউজিক। যে কোনো ক্ষেত্রেই ক্লাসিকাল কাজ সনাতন ও চিরন্তন। তার তুলনা সে নিজেই। টেস্ট ক্রিকেট ক্রিকেটারের সার্বিক পুরস্কারের পরীক্ষা নেয়, পাশাপাশি তার টেকনিক, টেম্পারমেন্টেরও বিচার করে। অন্যদিকে ৫০, ২০ ওভারের ক্রিকেট ক্রিকেটারের ফিজিক্যাল ফিটনেস ও এলিজিবিলিটির তুল্যমূল্য মূল্যায়ন করে। এই একটি ব্যাপারে সীমিত ওভারের ক্রিকেট টেক্কা দেবে টেস্ট ক্রিকেটকে। এখনকার ক্রিকেটারদের গতি ও ক্ষিপ্রতা আগের যুগের গ্রেট মাস্টারদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু আধুনিক ফিল্ডিংয়ের এই কার্যকরী রূপটিকে বাদ দিলে বাকি ক্রিকেটীয় সব বিচারে আগের যুগের ক্রিকেটাররা অনেক উন্নততর। ■

ফঃ ৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা ও কয়েকটি প্রশ্ন

ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন :

১। বিদ্যাসাগর কলেজের দিবা বিভাগের সময়কাল সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫-৪৫ মিনিট। ঘটনাস্থল অর্থাৎ কলেজের বিধান সরণী ক্যাম্পাস দিয়ে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজের (সান্ধ্য বিভাগ) প্রবেশের রাস্তা নয়। মেট্রোপলিটনে প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী গলির ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ বিধান সরণি ক্যাম্পাসের পিছনের রাস্তা দিয়ে। সুতরাং ওই সময়ে বিধান সরণি ক্যাম্পাসে সান্ধ্য কলেজের ছাত্রদের জমায়েত বৈধ নয়, এটি বলা বাহুল্যমাত্র।

২। বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন (প্রাতঃ বিভাগ) ও বিদ্যাসাগর কলেজের (দিবা বিভাগ) পড়ুয়ারা এই বিধান সরণি ক্যাম্পাস সংলগ্ন পথ দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু প্রাতঃ বিভাগের ছাত্রীদের ছুটি হয় দুপুরে। সুতরাং সন্ধ্যার সময় দিবা বিভাগের ছুটির প্রায় ৪৫ মিনিট পরে এত ছাত্র-ছাত্রী বিধান সরণি ক্যাম্পাসের ভিতরে জমায়েত হয়েছিল কী উদ্দেশ্যে? তবে কি পরিকল্পিত অশান্তি?

৩। যে সব ছাত্র-ছাত্রীকে দেখা গেছে, তার মধ্যে একজন আবার শোনা যাচ্ছে সিটি কলেজ (মেইন)-এর ২০০৮ সালের বি.কম-এর ছাত্র ছিল। বিদ্যাসাগর কলেজে (দিবা বিভাগ) কোনো বাণিজ্য বিভাগ নেই। তবে ওই সময়, ক্যাম্পাসের ভিতরে ওই ছাত্রটি কী করছিল? তবে কী সন্ধ্যার পর কলেজের ভিতরে বহিরাগতদের অবাধ গতি? চিন্তার বিষয়।

৪। যে হলুদ পাঞ্জাবি পরা ছাত্রটিকে ঘিরে অভিযোগ, একাধিক ভিডিয়ো ক্লিপে উঠে এসেছে বলে দাবি অর্থাৎ যাকে বাঁশ/লাঠি হাতে নাকি আঘাত করতে দেখা গেছে বলে অভিযোগ, সেই নাকি পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছে। বিষয়টি ভাবতে হবে। আশা করা যায় নিশ্চয়ই কোনো বিজেপি কর্মী ওই প্রতিবাদে শামিল হয়নি। তবে ছেলেটির পরিচয় কী?

৫। হঠাৎ আলো নেভানোর উদ্দেশ্য কী ছিল? নিশ্চয়ই বিজেপির কোনো কর্মী/সমর্থক অতি সন্তর্পণে কলেজে ঢুকে আলো নেভায়নি! তবে অন্ধকারে অপরাধীকে আড়াল করবার জন্য কি আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল?

৬। বাইকে আগুন লাগানোর ক্ষেত্রে বিজেপি কর্মীদের প্রতি যে অভিযোগ সে ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন : (ক) বাইকগুলো নাকি টানতে টানতে কলেজের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিধান সরণি ক্যাম্পাসের লাগোয়া যে প্রবেশ পথে বাইকগুলো ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই প্রবেশ পথে কটি লোহার বড়ো দরজা আছে। বলা হচ্ছে ওই দরজাটি অক্ষত। কেবলমাত্র নাকি বিজেপি কর্মীরা সজোরে ঠেলে তালার চেনটি ছিঁড়ে দিয়ে দরজাটি খুলে প্রবেশ করেছে। আমার প্রশ্ন, কয়েকশো মানুষ টানাটানি করলেও কি লোহার মোটা চেন ছিঁড়ে যায়? আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে কয়েকজন বিজেপি কর্মী ওই দরজাটিকে টানাটানি করেছিল তবে প্রশ্ন যে বিজেপির মিছিলে কি মানুষের বদলে দানবেরা হাঁটছিল, যাদের টানে একেবারে পটাং করে দরজার চেনটি ছিঁড়ে গেল? নাকি দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের জাদুস্পর্শে তালাটি নিজে নিজেই খুলে গেল? নাকি তালাটি আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছিল (পরিকল্পিত ভাবে)? মানুষ জানতে চায়।

(খ) আবার বলা হলো বিজেপি কর্মীরা নাকি রেলিং টপকে ভিতরে ঢুকেছিল। রেলিঙের ফলাগুলি টপকে গেল? মহামানব

নাকি? আর বাইকগুলো কি তবে রেলিংয়ের উপর দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে বাইরে নিয়ে এসেছিল?

ঘটনাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব মনে হচ্ছে না?

(গ) বলা হচ্ছে নাকি যে জায়গায় অর্থাৎ গেটের বাইরে বাইক পোড়ানো হয়েছে, সেখানে নাকি কেরোসিন তেলের গন্ধ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ সন্দেহ বাইকে আগুন লাগাতে নাকি কেরোসিন তেল ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) মিছিলে কি কেউ আগে থেকেই এই ভেবে তৈরি ছিল যে ওইখানে বাইক মজুত থাকবে, আর তাতে আগুন লাগানোর জন্য কেরোসিন তেলের পাত্র হাতে নিয়ে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে সুদূর পথ অতিক্রম করে সটান পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থলে। পুলিশ দেখতে পাবে না। কেউ বাধা দেবে না! সরাসরি কলেজে প্রবেশ করে বাইকগুলোকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এসে পুলিশ সহ জনসমক্ষে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেবে, কেউ কোনো বাধা দেবে না, দর্শকাসনে সকলে বিস্ময়ে লীলা দর্শন করবেন, এমন ভাবনাটা কি খুব যুক্তি গ্রাহ্য? নাকি আগে থেকেই কেরোসিন তেল মজুত ছিল?

(ঙ) উত্তেজিত জনতা যদি আগুন লাগায় তবে তো কলেজের ভিতরে যেখানে বাইকগুলো ছিল বলে দাবি সেখানেই আগুন লাগাতে পারতো। ভেবে চিন্তে বাইরে এনে আগুন লাগাবে কেন? তবে কী সুপরিকল্পিত ভাবে কোনও চিত্রনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা ছিল?

৭। এবার সরাসরি আসা যাক মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গে। ক্যাম্পাসের একতলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে যেখানে মূর্তিটি ছিল কলেজে ঢুকে সেখানে পৌঁছাতে হলে ২টি দরজা অর্থাৎ একটি লোহার গেট ও একটি কাঠের দরজা পেরোতে হয়। যদি ধরে নেওয়া যায় মিছিল থেকে কেউ ওই দুইটি গেট পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সযত্নে মূর্তিটি তুলে এনে বাইরে বার করে প্রবেশ পথে নিয়ে এসে ভাঙল, তবে—

প্রশ্ন : (ক) কেন কেউ বাধা দিল না?

(খ) উন্মত্ত জনতা যদি ভাঙে তবে তো মূর্তিটি যেখানে ছিল সেখানেই ভাঙতে পারতো। এতো ভেবে চিন্তে, সযত্নে বাইরে এনে ভাঙবে কি?

(গ) এই স্থানটিতো সিসিটিভি-র ঘেরাটোপে থাকার কথা। ফুটেজ কোথায়? কেন তা প্রকাশ্যে এলো না? নাকি সিসিটিভি নিষ্ক্রিয় ছিল? কেন ছিল? বলা হলো প্রায় মাসখানেক আগের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিসিটিভি দীর্ঘদিন থানায় রয়েছে। প্রশ্ন দীর্ঘদিন সিসিটিভি নিষ্ক্রিয় থাকা তো কলেজের নিরাপত্তারও পরিপন্থী। আরও প্রশ্ন যদি সিসিটিভি নিষ্ক্রিয় হয় তা তো বিজেপি কর্মীদের তা জানার কথা না। জানবে বিশেষ বিশেষ লোকজন, তবে কি নির্দিষ্ট ভাবে কেউ জেনে বুঝে চিত্রনাট্যটি রচনা করেছিল বিল্ডিংয়ের বাইরে ভেবে চিন্তে, পরিকল্পনা করে? রহস্যের উদ্ঘাটন হবে কোন ফুটেজের ভিত্তিতে? আন্দাজে? নাকি 'আমি সব জানি' নামক কোনো অন্তর্যামী আছেন? জানি না!

(ঘ) আসা যাক মূর্তির বয়স প্রসঙ্গে। দাবি করা হলো মূর্তিটির বয়স নাকি ২০০ বছর। আচ্ছা বলুন তো ১৮২০ সালে জন্মানো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বছর ২০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সূচনা হবে সেপ্টেম্বরে। আর মূর্তিটির বয়স নাকি ২০০ বছর। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের জন্মের আগেই বোধ হয় কেউ জানতেন তিনি পরিণত বয়সে কেমন দেখতে হবেন। তাই আগে ভাগেই তাঁর অবয়ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিষ্প্রাণ মূর্তিতে। অসাধারণ প্রাজ্ঞ চিন্তা ভাবনা! উন্নততর বাঙ্গলা বা বোধহয় বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বাঙ্গলার মহান প্রাণের ত্রিকালোজ্ঞ চিন্তার উচ্চতর ভাবনার মূর্ত বিকাশ! অথবা জেনে বুঝে ভণ্ডামি আর মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ও সন্তর্পণে মানুষের আবেগকে নিয়ে খেলা করার চেষ্টা।

৮। মিছিলে যারা হাঁটছিলেন তাদের অনেকেই নাকি 'মদ্যপ অবস্থায়' বিদ্যাসাগর কলেজে প্রবেশ করেছেন বলে দাবি করেছেন একজন স্বঘোষিত মহান্ শিক্ষাবিদ। যিনি নিজেকে দায়িত্বশীল নাগরিক বলে দাবি করেন। তাঁর এই কুৎসিত, কদাকার, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্যের প্রতিবাদ বা বিদ্রূপ করতেও রুচিতে বাধে। শুনলাম কোনো এক ব্যক্তি নাকি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারে সুদূর সোনারপুরের প্রত্যন্ত প্রান্তিক স্থানে ছিলেন। তিনি নাকি বুঝেছিলেন, শুনেছিলেন যে বিজেপির মিছিলে মদ্যপ অবস্থায় লোকজন হাঁটছিলেন! ধন্য কাণ্ডজ্ঞান! ধন্য দায়িত্ববোধ! ধন্য আঘ্রাণশক্তি! জানি না বিধান সরণি থেকে কোনো অলৌকিক বলে মদের গন্ধ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে ছড়িয়ে পড়েছিল! এহেন ত্রিকালদর্শী বিজ্ঞদের জানাই প্রণতি! আরও অভিযোগ মিছিলে হাঁটা লোকজন নাকি অন্যরাজ্য থেকে আমদানি করেছিল বিজেপি। এই মহান সর্বজ্ঞরা তা সহজেই তাদের মহান চিন্তাশক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। এদের পদধূলিতে ধন্য বাঙ্গলা! তাই এই রকেট বেগে অগ্রগতি, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে। বিজেপি কর্মীরা নাকি স্লোগান দিয়েছিল 'বিদ্যাসাগরকা নাম মিটাদো'— আরও কতো কী! জানি না, একজন যুক্তিবাদী বাঙ্গালি হিসেবে আমার প্রশ্ন বিজেপির কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এমন কোনো কাজ বিজেপি কর্মীরা করবে কি, যাতে প্রতীয়মান হয় বিজেপি বাঙ্গালি বিদ্বেষী? নাকি চক্রান্ত করার জন্যই তাদের যারা কোনো কর্মসূচি ছাড়াই কেবলমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য 'খিচুড়ি ঘোঁট' তৈরি করে ন্যূনতম নীতি আদর্শের তোয়াক্কা না করে? যাদের সামনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ ছিল নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক দল, যার ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি ছিল বিগত সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে। বিজেপিকে তবে কী রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা অসম্ভব ছিল? তাই প্রয়োজন পড়ল কাঁচা হাতের স্ক্রিপ্টে রচনা করা এক অসম্ভব নিম্নরুচির সস্তা যাত্রাপালার? যুক্তি কী বলে?

৯। পরবর্তী অভিযোগ ছিল সেদিন মিছিলে কোনো বাঙ্গালি ছিল না। 'মেড়ো খোট্টার দল' নাকি মিছিলে হেঁটেছিল। যদি তর্কের খাতিরে ধরেওনি যে মিছিলে কোনো অবাঙ্গালি ছিলেন, ক্ষতি কী? তাঁরা তো ভারতের নাগরিক। বাংলাদেশ থেকে ভাড়া করে এনে তো আর নির্বাচনী প্রচার করতে হয়নি। কারোও কারোও তো আবার সেটাও প্রয়োজন পড়ে, যা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা

খুব মনে পড়ছে। শ্যামাপ্রসাদ যখন পঞ্জাব থেকে কাশ্মীর রওনা হয়েছিলেন, এক সাংবাদিকের পারমিট প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন অখণ্ড ভারতে যদি দক্ষিণ কলকাতা (পূর্ব) কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে পঞ্জাবে আসতে তাঁর কোনো পারমিট না লাগে, তবে কাশ্মীর (যা দাবি করা হয় অখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ) যেতে পারমিট লাগবে কেন? আমি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসেবে জানতে চাইছি যদি কালকে আমি বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে উত্তর প্রদেশে অংশ নিই, তবে কি আমার পারমিট লাগবে? নাকি সেখানে গেলেই লোকে বলবে 'বাঙ্গালির দল' বিজেপির প্রচারে এসেছে। আত্মবলিদানের মাধ্যমে কাশ্মীরে পারমিট প্রথা তুলে দিয়ে ভারতকেশরী তথা পশ্চিবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় এক অনন্য নজির গড়েছিলেন। আর তাঁরই রাজ্যে যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে অন্য রাজ্য থেকে মানুষ এসেছিলেন, মিছিলে হেঁটেছিলেন, তবে তা কি অপরাধ? বাঙ্গলা কি বধ্যভূমি? অন্যের প্রবেশ নিষেধ? কেউ কেউ কি এখানে তবে পারমিট চালু করার পক্ষে? বিচ্ছিন্নতাবাদকে কে প্রশ্রয় দিচ্ছে? বিভেদকামী শক্তির প্রকৃত মদতদাতা করা? ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার পরিপন্থী কারা? প্রত্যেককে ভাবতে হবে! সতর্ক হতে হবে। জাগ্রত হতে হবে। যে সকল 'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো মহান প্রাণকে তাদের কুক্ষিগত বলে মনে করেন, উপচে ওঠা এই অজ্ঞ বিদ্যাধারীদেরকে দেখলে করুণা হয়। মন্তব্য করার জন্য সমকক্ষ বলে মনে করছি না, তাই মন্তব্য করে সময় নষ্ট করলাম না।

১০। তবে কি কারো এই বিষয়ে সংশয় ছিল যে বাঙ্গালি বনাম অবাঙ্গালি বিতর্ক উস্কে না দিলে বা বিজেপি বাঙ্গালি বিদ্বেষী এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে না জাগ্রত করতে পারলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যাবে না? আমাদের চিন্তা করতে হবে। এত কিছুর পরেও সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে জোড়াসাঁকো বিধানসভা ক্ষেত্রে মানুষ বিজেপিকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন, যার ফলশ্রুতি এই বিধানসভা ক্ষেত্রে বিজেপি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে, যা ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলের নিরীক্ষে প্রায় দশ হাজার ভোট বেশি। সুতরাং লাভের গুড় বোধ হয় পিঁপড়ে খেয়ে ফেলেছে। এই ফলাফল প্রমাণ করল এতদ্ অঞ্চলের যারা সুধী ভোটার তাঁরা বিজেপিকে তো বাঙ্গালি বিদ্বেষী মনে করেনই না, উপরন্তু বাঙ্গলার একমাত্র রাজনৈতিক ভরসা ও নিরাপত্তার স্থল বলে মনে করে। মানুষ জানে এই সকল মেকি বাঙ্গালি প্রেমীদের, কারা বিধানসভায় ঐতিহাসিক সম্পত্তি ধ্বংস করেছিল? কারা বাঙ্গালির আবেগের অন্যতন প্রাণকেন্দ্র, শিক্ষার পীঠস্থান প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকে মদত দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিশ্ববরেণ্য বাঙ্গালি বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক ল্যাবরেটরিতে ভাঙচুর চালিয়ে বিশ্বের দরবারে বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালির মাথা হেঁট করে দিয়েছিল। বাঙ্গলার ইতিহাস সম্পর্কে নেই ন্যূনতম ধারণা, বাঙ্গলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধের যথেষ্ট অভাব যাদের, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের বৃহত্তম দল তথা ভারতীয় জনসঙ্ঘের উত্তরসূরি ভারতীয় জনতাপার্টির কর্মীরা তাদের থেকে বাঙ্গলার প্রতি দায়বদ্ধতার পাঠ নেবে না। তাই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী, জনগণমন অধিনায়ক নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর ভাষায় 'জনতা জর্নাদন' দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এই মেকি বাঙ্গালিপনার গোরুকে নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডলীই সক্রিয়ভাবে টেনে গাছ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত এই বিধানসভা ক্ষেত্রে ফানুস শতছিদ্র হয়েছে। কাল্পনিক গল্পের যে 'গুল্প' তা আর বোধহয় কাজে এলো না!

ভারতকেশরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের নবরূপকার, বাঙ্গালির হৃদয়ের মণিকোটার স্থায়ী সম্রাট বঙ্গজনক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিধন্য, তাঁর মহান কর্মক্ষেত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা তার অধীনস্থ কোনো মহাবিদ্যালয়ে বিজেপির কোনো কর্মী, সমর্থক বা শুভাকাঙ্ক্ষী কখনও কোনো অবস্থাতেই আঘাত হানতে পারে কোনো বাঙ্গালি তা বিশ্বাস করেন না। বিজেপি এই ক্ষেত্রগুলিকে মন্দির অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র মনে করে। আর এই বিষয়ে চেতনা জাগ্রত করতে হলে নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি করা প্রয়োজন। এমন দলের অনুসারী, যাদের দলের নেই কোনো নীতি, আদর্শ, অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি, উজ্জ্বল ইতিহাস তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর নয়। বিশৃঙ্খলা ও গালাগালি যাদের সম্পদ তাদের থেকে বাঙ্গালি নেবে সংস্কৃতির পাঠ? দুর্ভাগ্যজনক আবদার! আর যারা বিজেপিকে 'মেড়ো খোট্টার দল' বলে বিদ্রূপ করে, তাদের অবগতির জন্য জানাই এই দলের প্রতিষ্ঠাতা না থাকলে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ এই সকল কথা বলার মতো পরিস্থিতিও তাদের থাকতো না। এই সকল স্বঘোষিত শিক্ষাবিদদের উদ্দেশ্যে বিনীত আবেদন ইতিহাস জেনে কথা বলুন। এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ইতিহাসের কথা বলছি। গালগল্পে ভরা স্বরচিত ইতিহাস নয়। এদের জ্ঞানের অজ্ঞতার প্রতি পরমেশ্বরের কাছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আমার প্রার্থনা— 'এদের চৈতন্য হোক'। পরিশেষে সকলের প্রতি যাঁরা পাশে ছিলেন সহযোদ্ধা বা সমর্থক বা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে, যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন, যাঁরা মনের সুখে কুৎসা ও গালাগালি করেছেন, আর বিশেষত যারা বিজেপির এই বিপুল জয়ে হতাশায় ভুগছেন, তাঁদের সকলকে জানাই জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন। সুধী নাগরিকদের প্রতি আবেদন, বাঙ্গলার গৌরব ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলিকে বিকাশের মূলস্রোতে যুক্ত করতে তথা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শনের সার্থক রূপদানের উদ্দেশ্যে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ ও সমর্থন করে বিকাশ ও প্রগতির ধারাকে সুনিশ্চিত করে জাগ্রত ও উন্নত বাঙ্গলা গঠনের পথখে প্রশস্ত করুন। আসুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক নিরাপদ ও নির্মল বাঙ্গলা গড়ে তুলি।

(লেখক বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক)

অস্কার অ্যাকাডেমির সভাপতি জন বেইলির ‘ডিজিটাল ডিলেমা’র হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের (অস্কার অ্যাকাডেমি নামে সর্বাধিক জনপ্রিয়)-এর সভাপতি জন বেইলি গত ২৮ মে দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অ্যাকাডেমির প্রকাশন ‘ডিজিটাল ডিলেমা’র হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব অমিত খারে, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সম্পাদক ও অ্যাকাডেমির গভর্নর শ্রীমতী ক্যারল লিটিনটন, সিবিএফসি-র চেয়ারম্যান প্রসূন যোশী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ডিজিটাল ডিলেমার হিন্দি ভাষায় ই-সংস্করণ প্রকাশ করে জন বেইলি বলেন, ভারতে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাছে আরও বেশি সংখ্যায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে অ্যাকাডেমি প্রকাশনের হিন্দিতে অনুবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের দরুন চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে বহু চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে। হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত এই ই-সংকরণটি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতে এবং উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে সাহায্য করবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

পশুপালকদের স্বার্থে নতুন মন্ত্রীসভার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পরিণাম প্রকাশের পর এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক নতুন উদ্যোগের অনুমতি পাওয়া গেছে। যার ফলে পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি ব্যক্তি উপকৃত হবেন এবং গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে।

মন্ত্রীসভা গবাদিপশুর মুখ ও খুরে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তার ফলে পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন লাভবান হবেন। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো, আগামী পাঁচ বছরে দেশে গবাদি পশুর মুখ ও খুরে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগব্যাধি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। একই সঙ্গে, পর্যায়ক্রমে এ ধরনের অসুখ নির্মূল করা। কর্মসূচি রূপায়ণে ১৩ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গোরু, বলদ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর প্রভৃতি গবাদিপশুর মধ্যে মুখ ও খুরে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ প্রায়শই দেখা যায়। যদি কোনও গোরু বা মহিষ এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়, তা হলে প্রদেয় দুধের পরিমাণ ৪-৬ মাস পর্যন্ত ১০০ শতাংশ হ্রাস পায়। এমনকী, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের ফলে পশুর জীবৎকালে প্রদেয় দুগ্ধের পরিমাণ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এছাড়াও, গবাদিপশুর গর্ভধারণ ক্ষমতাতেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। শুধু তাই নয়, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত এই রোগের ফলে গবাদি পশুর দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও আক্রান্ত হতে পারেন। সর্বোপরি এ ধরনের অসুখ গবাদিপশুর দুগ্ধ উৎপাদন এবং অন্যান্য পশুজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে গবাদি পশু পালনের সঙ্গে যুক্ত দেশের কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। গবাদিপশুর এ ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণে যে কর্মসূচিটি চালু ছিল, তার খরচ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ভাগাভাগি করে নিত। এবার থেকে এই কর্মসূচি রূপায়ণের সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে বলেই স্থির হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের জন্য পেনশন প্রকল্পে মন্ত্রীসভার সায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যবসায়ীরা বড়ো অবদান রাখেন। ব্যবসায়ী মহলের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এক নতুন প্রকল্প শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবসায়ী মহলকে পেনশন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার এক মজবুত কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নতুন এই প্রকল্পের আওতায় ৬০ বছর বয়স থেকে সমস্ত দোকান মালিক, খুচরো ব্যবসায়ী এবং স্বনিযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা মাসিক তিন হাজার টাকা পেনশন পাবেন। জিএসটি লেনদেনের পরিমাণ দেড় কোটি টাকার কম এমন ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী ছোটোখাটো দোকান মালিক এবং স্বনিযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই পেনশন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এর ফলে ৩ কোটির বেশি ছোটো দোকান মালিক ও ব্যবসায়ী উপকৃত হবেন। প্রকল্পে শামিল হতে গেলে আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের সঙ্গে স্ব-ঘোষণাপত্র জমা করতে হবে। অন্য কোনও নথির প্রয়োজন পড়বে না। সারা দেশে ৩ লক্ষ ২৫ হাজারেরও বেশি অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে এই প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করা যাবে। প্রকল্পের গ্রাহক যে পরিমাণ অর্থ মাসিক প্রিমিয়াম হিসাবে জমা করবেন, সমপরিমাণ অর্থও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জমা করা হবে।

ব্যবসায়ী মহলের জন্য পেনশন প্রদানের এই উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা দেশবাসীর কাছে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা পূরণ করতে সমর্থ হলেন।

সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেখকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে : উপরাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষের মনে প্রগতিশীল ও ইতিবাচক ভাবনাচিন্তার প্রসার ঘটাতে লেখক ও সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু মত প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি বিশাখাপত্তনমে প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক কান্দুকুরি বীরেসালিঙ্গমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও মোজাইক সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের ভাষণে শ্রী নাইডু, অন্ধ্রের রাজা রামমোহন রায় বলে সুপরিচিত বীরেসালিঙ্গমকে শ্রদ্ধা জানান। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, বীরেসালিঙ্গম কেবল প্রগতিশীলই ছিলেন না তিনি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের পক্ষেও মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রী নাইডু বলেন, আধুনিক যুগের লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও সংবাদপত্রের লেখকদেরও সমাজে আধুনিক ও সংস্কারমুখী ভাবনাচিন্তার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে, নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও ধরে রাখতে হবে। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, কেবলমাত্র সমাজের প্রকৃত ঘটনাবলী প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, লেখকদের সমাজের অবক্ষয়ের দিকগুলি তুলে ধরে, সামাজিক সংস্কার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে হবে।

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ দ্রুত গতিতে উন্নতি করলেও এখনও বহু সমস্যা রয়েছে। সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে শ্রী নাইডু লেখদের আহ্বান করেন, সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মানুষের মধ্যে স্বভাবগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। সমাজের মধ্যে ঐক্যের প্রসার ঘটাতে এবং ভেদাভেদ দূর করতে লেখক-সাহিত্যিকদের কাজ করতে হবে বলেও তিনি জানেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে দুটি যোগ-অ্যাপের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে দু'দিনের যোগ মহোৎসবের সূচনা করেন। যোগচর্চার উপকারিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করে তুলতে আয়ুষ মন্ত্রকের অধীন মোরারজি দেশাই জাতীয় যোগচর্চা প্রতিষ্ঠান এই মহোৎসবের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে যোগচর্চার সঙ্গে যুক্ত পেশাদার ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিরাট জনসভায় রাজীব কুমার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগচর্চাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। ভারতীয় পরম্পরাগত ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রসারে আরও উদ্যোগী হতে শ্রী কুমার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, যোগ প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে জীবনযাপনের প্রকৃত পন্থা প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েক সুস্বাস্থ্য ও মানসিক কল্যাণে সর্ববৃহৎ জনআন্দোলন হিসেবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের ভূমিকায় প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, পরম্পরাগত চিকিৎসা-পদ্ধতি কেবল ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে প্রসার ঘটছে। তাঁর মন্ত্রক কেবল যোগেরই নয়, অন্যান্য পরম্পরাগত চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলিরও গবেষণা ও উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ বলে শ্রী নায়ক জানান।

খসড়া শিক্ষা নীতি নিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ব্যাখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন নিয়ে ড. কস্তুরিরঙ্গণের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তার খসড়া নথিপত্র মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে শুক্রবার জমা পড়েছে। এ সম্পর্কে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে : (১) কমিটির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া নথিপত্র, খসড়া নীতির অঙ্গ। এই খসড়া নীতি জনসমক্ষে নিয়ে আসা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মতামত জানা এবং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি চূড়ান্ত করবে। (২) নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার সমস্ত ভারতীয় ভাষা অভিন্ন উন্নয়ন ও বিকাশে অঙ্গিকারবদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনও ভাষায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এমনকি, কোনও ভাষার বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণও করা হবে না।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

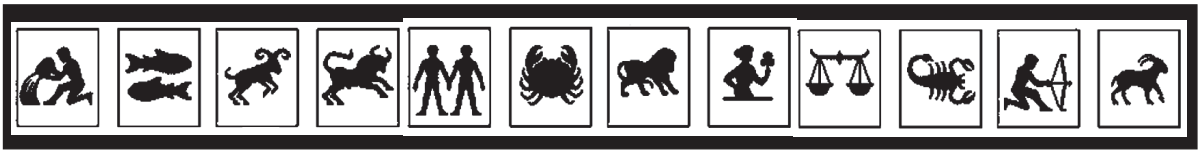

১০ জুন (সোমবার) থেকে ১৬ জুন (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে রবি, শুক্র, মিথুনে মঙ্গল, বুধ, রাহু, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। ১৫ জুন, শনিবার সন্ধ্যে ৬-৩৭ মিনিটে রবির মিথুনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র সিংহে পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্র থেকে বৃশ্চিকে অনুরাধা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে প্রতিকুল অবস্থার অবসান। কর্মসংক্রান্ত একাধিক যোগাযোগ। প্রভাবী ব্যক্তিত্ব, সফল মনস্কাম, গুণীজন সান্নিধ্য, গৃহ ও বাহন যোগ। সৃজনশীল কর্ম ও আত্মীয় সমাগমে আনন্দঘন পরিবেশ। বিদ্যার্থী ও অসুস্থদের জন্য সপ্তাহটি অনুকুল নহে।

বৃষ ঃ কর্মে অসহযোগিতা, পারিবারিক অসুস্থতা ও জীবনসঙ্গীর অদূরদর্শিতা। প্রেমিক-প্রেমিকার লুকোচুরি খেলায় ব্যথিত মন। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের অর্জিত জ্ঞানের বাস্তবায়ন ও নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা। জীবিকার বিকল্প পথের সন্ধানে প্রতিবেশীর সাহায্য।

মিথুন ঃ কর্মক্ষেত্রে চাপ, মানসিক চঞ্চলতা। ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, প্যাথলজিস্ট, পশুচিকিৎসকের পেশাগত দক্ষতা, প্রতিপত্তি ও প্রশংসা লাভ। সপ্তাহটি বৈষয়িক উন্নতি-পারিবারিক সমৃদ্ধির সহায়ক। বিদ্যার্থী ও সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য ও সম্ভ্রম। বাহন চালকদের সতর্কতা প্রয়োজন।

কর্কট ঃ স্বজন সম্পর্কে উন্নতি, ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে প্রাপ্তি, অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তায় সংবেদনশীল মন, গৃহ সংস্কার ও নব নির্মাণের পূর্ণতা। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি, উৎসাহজনক আর্থিক স্থিতি। শিল্পী ও কলাকুশলীদের নব আনন্দে সৃষ্টির আনন্দ ধারায় প্রশংসা ও সুনাম।

সিংহ ঃ আনন্দঘন পরিবেশ। তবে পেশাগত ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার উদ্ভব। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় পারিবারিক সুস্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সন্তান-সন্ততির বিবাহ সমাপন। প্রেমজ ব্যাপারে উৎসাহ বৃদ্ধি হলেও সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন।

কন্যা ঃ ভ্রাতা-ভগ্নী, প্রতিবেশী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি দয়া হৃদয়ের সপ্রতিভতা ও মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি। ব্যবসায় নতুন উদ্যোগে আভিজাত্য বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন সহ তীর্থ ও দেব দর্শন। পিতার চিকিৎসাজনিত উদ্বেগ। মান-সম্মানের ক্ষেত্রে শুভ নহে।

তুলা ঃ শিল্প ও সৌন্দর্য্যের পূজারী, উন্নত রুচি ও স্নেহপ্রবণ মন, মিষ্ট স্বভাবের প্রকাশ। বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ, বিহ্বল চিত্ত, কর্মে অনীহা, সময় ও অর্থের অপচয়। মিত্র শত্রুতে পরিণত হবে। জেদ পরিহারে সমস্যার নিষ্পত্তি। কর্মপ্রার্থীর আসন্ন সিদ্ধি করায়ত্ত হয়েও শেষ রক্ষা না হওয়ার সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক ঃ অসুস্থতা ও অবৈধ প্রেমজ যোগাযোগ। বিরোধিতা, সমালোচনায় ব্যথিত হৃদয়। মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যে নতুন কর্মপরিকল্পনায় ঋণ প্রাপ্তি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে মানসিক প্রশান্তি। বিদ্যার্থী ও কর্মপ্রার্থীদের চিন্তার উর্বরতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা।

ধনু ঃ ভ্রাতা-ভগ্নী ও সন্তান-সন্ততির জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বৈষয়িক সমৃদ্ধি। উপার্জনের বিকল্প পথের সন্ধান। স্ত্রীর পদোন্নতি, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে প্রশংসা। ফ্যাশন ডিজাইনার, নির্মাণশিল্প, হোটেল, রেস্তোরা, কমার্শিয়াল ম্যানেজমেন্ট ও শল্যচিকিৎসকের বিত্ত ও চিত্ত সন্তুষ্টি।

মকর ঃ কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি বিদ্যা ও ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। কর্মপ্রার্থীদের সিদ্ধি করায়ত্তের সম্ভাবনা। রমণীর বুদ্ধিমত্তায় বহুদিনের ইচ্ছাপূরণ, শৌখিন, বিলাসদ্রব্য ক্রয় ও নিকট ভ্রমণে ব্যায়াধিক্য ও ঋণ বৃদ্ধি। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও মানসিক অস্থিরতায় সংযত থাকুন।

কুম্ভ ঃ জ্ঞান পিপাসার চরিতার্থতা। কর্মে নতুন উদ্যোগে বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ। প্রিয়জনের বিবাহ, পৈত্রিক সম্পত্তি বিষয়ক ফলপ্রসু আলোচনা। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি, সমাজ প্রগতিমূলক কর্মে অনাবিল আনন্দ। গণিতজ্ঞ, সার্ভেয়ার, চাটার্ড, আর্কিটেকচার, প্রযুক্তিবিদের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।

মীন ঃ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যয়দীপ্ত পথ চলায় কর্তৃপক্ষের প্রশংসা প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন সহ জলজ ভ্রমণ। কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থান পরিলক্ষিত হয়। বাড়ি-গাড়ি বস্ত্র-অলংকার ও গৃহসজ্জায় অভিজাত্য গৌরব। সাহিত্য পিপাসুদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণার্থে নতুন চিন্তা ভাবনার উদ্ভাবনায় সৃষ্টির উল্লাস।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চনাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796